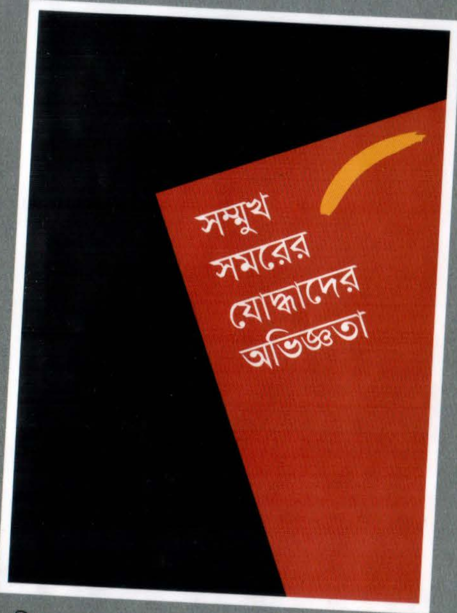
# স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

সম্মুখ সমরের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা

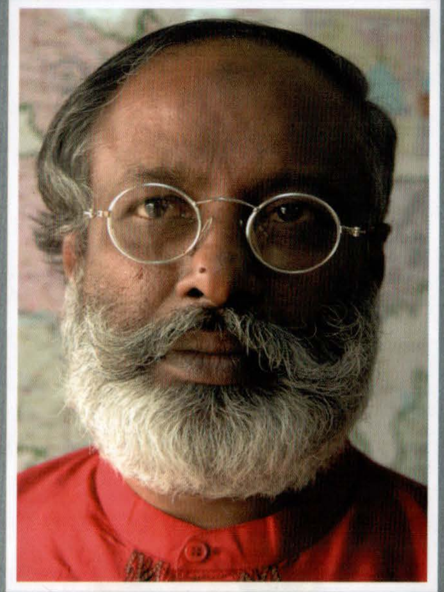
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
সম্পাদিত




স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারি ২০১২

**স্বাধীনতা (চতুর্থ খণ্ড)**
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)



প্রকাশক




সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
**অনন্যা**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
E-mail ananyadhaka@gmail.com

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**, 37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor ❑ **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202
Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave. Toronto

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

Shadhinata (volume-4) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, (Ground Floor), House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Ensh. Price Taka 150.00 Only US # 8

ISBN 984 70008 0021 1

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন



# সম্পাদকের কথা

সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি যতটা বেশি হয়েছে ততটাই কম লেখালেখি হয়েছে আমাদের সম্মুখ সমর নিয়ে। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেদের মাঠের অর্জনের কথা বলছি। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের কথা বলছি। একাত্তরপূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মাটিবর্তী মানুষরাই ছিল প্রধান নিয়ামক। রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলিও ছিল নিম্নবর্তী সৈনিক নির্ভর এবং সে ইউনিটগুলির বৃহদাংশই ছিল ছ'সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাত্তরের ছাত্র, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ। তারা অধিকাংশই তখনো কৈশোর পেরোয়নি। স্বাধীনতা ওদের কাছে একটি বাস্তব বিভাজক। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি তাদেরকে প্রান্তবর্তী করে ফেলেছে। লেখা আর কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই ব্রাত্যজনদের উচ্চকিত প্রশংসা করা হলেও তার সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' আখ্যায়িত হয়ে তাদের তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আগামী পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা বয়সের ভার কাঁধে নিয়ে বাঁচবেন বার্ধক্যজনিত রোগ বালাই নিয়ে। লেখালেখির সময় তখন আর তাদের থাকার সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা লিখতে পারেননি। যারা হয়তো চেষ্টা করলে লিখতে পারতেন সেই সংখ্যালঘু শিক্ষিত যোদ্ধারা উদ্যোগী হননি। ফলে লেখা হয়েছে অতি সামান্য। ইতিহাসবেত্তা বা যাদের লিখিত উপস্থাপনা ভালো তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই অহংকারের কাহিনী 'কথ্য ইতিহাস' আকারে লিপিবদ্ধ করেননি। এ বিষয়ে সাহিত্য অঙ্গনের লোক যুদ্ধের মাঠে না থাকায় উঠে আসেনি আমাদের 'যুদ্ধ সাহিত্য'। ঢাকার পত্রিকা এবং ছাপা মাধ্যমগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের খ্যাতিমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি বলে তাদের যুদ্ধকাহিনীগুলো ছাপেনি। অথচ এই যুদ্ধকথা লিপিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ' মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ছাপাবে— এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের লেখা সংগ্রহ করছে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পরবর্তী প্রজন্ম দ্বারা এই দোষে দুষ্ট আখ্যায়িত না হন যে তারা তাদের যুদ্ধকথা রেখে যাননি। এই বই সেই প্রয়াসে প্রথম প্রকাশ। আশা করি *স্বাধীনতা* পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখতে পারব।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৭

**মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া**

## দ্বিতীয় খণ্ডের কথা

যৌক্তিক কৈফিয়ত থাকলেও *স্বাধীনতার* (দ্বিতীয় খণ্ড) বের হবার বিলম্বের জন্য আমিই দায়ী। যে যোদ্ধাদের লেখার চল নেই তাদেরকে দিয়ে লেখানো কষ্টকর। লেখাগুলি সাহিত্যের বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে না দেখতে অনুরোধ রইল। তবুও অব্যাহত থাক *স্বাধীনতার* প্রকাশ।

ঢাকা **মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া**
ফেব্রুয়ারি ২০১০

## তৃতীয় খণ্ডের কথা

প্রচণ্ড অসুস্থতা নিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট করে *স্বাধীনতা* (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশ করা হল। সে কারণেই কলেবর ছোট হয়ে গেছে। তবুও বের করা গেল সেখানেই স্বস্তি।
এ বইয়ে যে সকল সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নাম এসেছে তারা সবাই অবসরপ্রাপ্ত।

ঢাকা **মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া**
ফেব্রুয়ারি ২০১১

# চতুর্থ খণ্ডের কথা

*স্বাধীনতা* চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ কেবলই ধারাবাহিকতা। তারপরও আনন্দদায়ক। মুক্তিযোদ্ধাদের কলম থেকে লেখা উঠে আসছে এও কম তুষ্টির কথা নয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ— আপনারা আপনাদের যুদ্ধের কাহিনী লিখে পাঠান, সহযোদ্ধাদেরও বলুন। পাঠকদের প্রতিও অনুরোধ পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের এ বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে। একাত্তরের ভারতীয় BSF এর Inspector General, West Bengal ছিলেন গোলক মজুমদার। তিনি মুক্তিযোদ্ধা নন, এ খণ্ডে তার লেখাটিও সমুখ সমর বিষয়ক নয়— প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে। এ লেখাটি ছেপে যে অন্যায় করেছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাঠক লেখাটি পড়ে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

# সূচিপত্র

# তাজউদ্দিন আহমদ : একটি উজ্জ্বল স্মৃতি

গোলক মজুমদার

তখন পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। নির্বাচনে সবকটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে আওয়ামী লীগকে সমগ্র পাকিস্তানের বৃহত্তম বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে মেনে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং তারই কোনো সহকর্মীকে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের কল্পনার অতীত। তাই শুরু হলো নানা রকমের টালবাহানা এবং নির্বাচনী রায়কে এড়িয়ে যাওয়ার কূট অভিসন্ধি। সমস্ত আলাপ আলোচনায় শেখ মুজিব এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটিমাত্র দাবি-নির্বাচনী রায়কে কার্যকর করতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতৃবৃন্দকে এবং তাবৎ বাঙালি জনসাধারণকে বরাবরই অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। বাঙালি জনসমাজ তাদের অত্যাচারে জর্জরিত। বাণিজ্য, শিল্প, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সব ক্ষেত্রেই বাঙালিরা বঞ্চিত। এমনকি বাংলা ভাষার ওপর তাদের বলাৎকার, বাঙালি সংস্কৃতি তাদের চক্ষুশূল। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীতের কণ্ঠরোধে তাদের নিত্যনতুন প্রচেষ্টা। শেখ সাহেবের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত এই দাবি তাদের কাছে অন্যায় এবং অসহ্য বলে মনে হলো। বাঙালিরাও জানিয়ে দিলেন সে ক্ষেত্রে তাদের পুর্ব পাকিস্তান থেকে বিদায় নিতে হবে। ভুট্টো সাহেব ঢাকা থেকে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন, নিষ্ক্রান্ত হলেন ইয়াহিয়া খানও। যাওয়ার সময় নির্দেশ দিয়ে গেলেন দূর্বিনীত বাঙালিদের শায়েস্তা করতে। শুরু হয়ে গেল পশ্চিমা সশস্ত্রবাহিনীর তাণ্ডব। রাজধানী ঢাকায়, জেলা ও মহকুমা শহরে, রেলস্টেশনে, বন্দর ও বিমানঘাঁটিতে; এমনকি গ্রামে-গঞ্জে ত্রস্ত, বিহ্বল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র লালসায় সেনাবাহিনী-শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের সাহায্যপুষ্ট অবাঙালি আনসার ও মুজাহিদ দল। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। ইপিআর, আনসার, পুলিশবাহিনীর কিছু অংশ তাদের নিরস্ত করার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল এবং ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। শেখ সাহেবের পূর্বঘোষিত নির্দেশে তখন সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বন্ধ, দেশব্যাপী হরতাল এবং জনজীবন অচল। ভারতের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের এই অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মীরা এবং অন্যান্য কয়েকটি

সংস্থা। গণবিক্ষোভ ও সন্ত্রাসের ঢেউ সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতে আছড়ে পড়তে পারে বলে এই সতর্কতা।

১৯৭১-এর ৩১শে মার্চ। খবর এল আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা, হয়তো বা শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শোনা মাত্র তার সঙ্গে কথা বলতে রওনা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার মুখে উপস্থিত হলাম নদীয়া জেলার টুঙ্গি সীমান্ত চৌকিতে। সঙ্গী কর্নেল চক্রবর্তীর চেষ্টায় মহকুমা শাসক তৌফিক এবং পুলিশ অধিনায়ক মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তারা জানালেন শেখ সাহেবকে দেখা যায়নি তবে অন্য দুইজন নেতা ওখানে আত্মগোপন করতে এসেছেন এবং মুসলীম লীগ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রাণে বাঁচা কঠিন। অনেক অনুরোধ ও আশ্বাসে তারা ওই দুই নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। একজন হলেন তাজউদ্দিন আহমদ এবং তার সঙ্গীর নাম আমীর-উল-ইসলাম। তাদের পরনে ছিল ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি। ক্লান্ত মুখে চার পাঁচ দিনের দাড়িগোঁফ, পায়ে রাবারের ছেঁড়া চটি। একেবারে কৃষকের সাজ। অনাহারে-অর্ধাহারে শরীর দূর্বল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। তাজউদ্দিন সাহেব জানালেন সামরিক বাহিনীর চরম আঘাতের ঠিক আগে শেখ সাহেবের নির্দেশমতো তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। কথা ছিল শেখ মুজিবও তার সঙ্গে আসবেন কিন্তু পূর্বনির্ধারিত স্থানে ও সময়ে তার দেখা মেলে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন সেনাবাহিনী পথে ঘাটে বেরিয়ে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে তাকে ও আমীর-উল-ইসলামকে হাঁটা শুরু করতে হয়। শেখ সাহেবের কোনো খবর তিনি আর পাননি এবং তার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। তাজউদ্দিন সাহেব বললেন, দেশে প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপদ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত কিন্তু ভারতে আশ্রয় নিতে তিনি আগ্রহী নন। কেননা শেখ সাহেবের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে ভারতই বাঙালির শেষ সম্বল সুতরাং এমন কিছু যেন না করা হয় যাতে ভারত বিব্রতবোধ করে। সার্বিক অবস্থার বিশদ পর্যালোচনা করে যখন তাকে বোঝানো গেল যে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়, যোগ্য নেতার অভাবে গণবিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যাবে এবং তিনি এলে ভারত কোনোভাবেই বিব্রত হবে না তখন তিনি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে কলকাতা রওনা হন। পথে কিছু আনসার ও মুসলিম লীগ সদস্য অন্ধকারে তাকে আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সতর্কতার ফলে ওদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দমদম বিমানবন্দরে সেই রাতেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে এফ রুস্তমজী এসে পৌঁছুলে তাজউদ্দিন ও আমীর-উল-ইসলামের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং পরে রুস্তমজী সাহেবের পাজামা-পাঞ্জাবী পরে প্রায় শেষ রাতে তারা সামান্য আহার করলেন।

এই সময়ে তাজউদ্দিন সাহেব জানালেন পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা সমস্ত বিলাস-ব্যসন, খানাপিনা পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছেন। তারপর আরম্ভ হলো কথাবার্তা। অত্যন্ত সরল করে এবং সহজ ভাষায় তাজউদ্দিন সাহেব

পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন এবং জানালেন বাঙালির জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত করতে ইয়াহিয়া, টিক্কা খান ও ভুট্টো চক্র বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলার স্থান এবং কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব তার ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সকালের দিকে তারা বিশ্রাম করতে গেলেন। ইতোমধ্যে রুস্তমজী সাহেব দিল্লির সঙ্গে কথা বললেন এবং স্থির হল তাদের সেখানে যেতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরের দুদিন দফায় দফায় রুস্তমজী সাহেব তাদের সঙ্গে কথা বলেন। মোটামুটি স্থির করলেন পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে রাখা হবে বাংলাদেশ, পতাকা হবে সবুজ জমিতে সোনালী রেখায় চিত্রিত বাংলাদেশের মানচিত্রসহ লাল সূর্য, জাতীয় সঙ্গীত হবে রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"। এবং সরকার হবে ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্র। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল লেখাগুলো তাজউদ্দিন আহমেদ ঠিক করে দিলে আমীর-উল ইসলাম এবং প্রখ্যাত-ব্যরিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী তার সহকর্মীদের সাহায্যে ঘোষণাপত্র রচনা কাজে হাত দেন।

সেদিন ছিল শহরে হরতাল। বিশেষ অনুরোধে দোকান খুলিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব ও আমীর-উল-ইসলামের জন্য জামাকাপড়, স্যুটকেস এবং জুতা মোজা এ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা হয়। ওষুধপত্রের বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় যেহেতু তার অভ্যস্ত ওষুধ ভারতে অচল। তাজউদ্দিন সাহেবের ইচ্ছামতো তাকে টুঙ্গী সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি সহকমীদের কিছু নির্দেশ পাঠান এবং ভারতের মনোভাব সম্বন্ধে অবহিত করেন। কলকাতায় ফিরে দিল্লি যাওয়া প্রস্তুতি নিতে হয়। মধ্যরাতে বিশেষ বিমানে তাদের নিয়ে যাত্রা করি। শ্রান্তিতে তারা সেই বিশাল বিমানের মেঝেতে শুয়ে পড়েন এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান। রাত আড়াইটার সময় যখন পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছাই তখন অন্যান্য সমস্ত বিমানের জন্য বিমানবন্দর বন্ধ ছিল নিরাপত্তার স্বার্থে। বিশেষ মোটরযোগে বিদেশী গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে অনেক ঘোরা পথে তাদের গুপ্ত বাসস্থানে নিয়ে আসা হয়। পরের দিন তাজউদ্দিন আহমদ-এর প্রকৃত পরিচয় এবং আওয়ামী লীগে তার প্রতিপত্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই যারা দিল্লি এসে পৌঁছেছিলেন এমন কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও ব্যক্তিবর্গকে তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে আসা হয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায়। তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এদের প্রথম দর্শন এবং কথাবার্তায় দিল্লির কর্তারা নিশ্চিত হন যে, শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী তাজউদ্দিন সাহেব এবং তার অনুপস্থিতিতে লীগের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম এবং এর অধিকারী একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ। তারপর তিনি বিদেশ সচিব, রাজ্যসচিব, দেশরক্ষা সচিব বহু সংস্থার প্রধানবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর সচিব ও উপদেষ্টা এবং অবশেষে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচানায় স্থির হয় লীগের প্রধানদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সরকার গঠন করতে হবে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সুযোগ মত ঐ দেশেরই কোনো স্থানে প্রকাশ্য সভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ, সরকার গঠন, মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুব শক্তিকে যোগদান করতে আহ্বান প্রভৃতি অনুষ্ঠানও প্রচারের আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। প্রথম থেকেই তাজউদ্দিন সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি করতে থাকেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঠিকই দেওয়া হবে আশ্রয়দান বস্তুত স্বীকৃতি দান। ইতোমধ্যে আমি কলকাতা ফিরে তাদের থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরে ফেলি এবং টেলিফোনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলার সঙ্গে প্রয়োজনমতো যোগাযোগের গোপন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করি।

দিল্লী থেকে ফিরে তাজউদ্দিন সাহেব যুব নেতাদের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের জন্য কয়েকটি সামরিক শিক্ষার ও অভিযানের ঘাঁটি স্থাপন করান। সামরিক বাহিনী এবং ইপিআর-এর দলত্যাগী অফিসারবৃন্দ এইসব ঘাঁটির ভার নেন। ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ভারতে আনিয়ে নেন। এদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক, কামরুজ্জামান প্রমুখ। অনেক এমএনএ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও সমাগম হয়। এদিকে ত্রিপুরার পথে কর্নেল ওসমানী এবং ধুবড়ীর পথে মাওলানা ভাসানী এসে পড়েন। আবদুস সামাদ আজাদ, মনি সিংহ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আইনবিদ নূরুল আলম প্রমুখকে প্রায়ই দেখা যেত। ইতোমধ্যে সমস্ত এমএনএকে উদ্বুদ্ধ করে তাজউদ্দিন সাহেব সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, মন্ত্রিসভার সদস্য, জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অনুমোদন করিয়ে নিলে মুজিবনগরের আমবাগানে শত শত দেশবাসীর সামনে এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সম্মুখে বাংলাদেশের জাতীয় সরকার শপথগ্রহণ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাজউদ্দিনের নির্দেশে কলকাতার পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী তার আনুগত্য পরিবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম কূটনৈতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কত সূক্ষ্মতার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে তাজউদ্দিন সাহেবকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। নির্বাসনে গঠিত সরকার চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও তিনি করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে সেই অর্থ সরাসরি তাদের তহবিলে জমা পড়ার ব্যবস্থা তিনি সহজেই পাকা করেন। পাকিস্তানি রাজকোষের টাকাও তার চেষ্টায় ঠিকমতো আসতে থাকে। বিদেশী মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ করতেন এবং অনেক সময়েই তাকে হাসিমুখে প্রাণ বিপন্ন করেও এগিয়ে যেতে দেখা যেত। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের চাপ তার উপর প্রবল হলেও তিনি তার কাছে নতিস্বীকার করেননি, কেননা তিনি নিশ্চিত জানতেন অধিকসংখ্যক মন্ত্রী অধিকসংখ্যক সমস্যারই সৃষ্টি করবে। সকলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির পথে এগিয়ে

যাবে। ভারতের প্রতি তার বন্ধুত্বের মনোভাব বিষিয়ে দিতে অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন। কেন আরো অর্থ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, কেন আরো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আসছে না, কেন ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করছে না? এক কোটি শরণার্থীর ভার আমাদের গরিব দেশের পক্ষে কী ভয়ানক তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন আর আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে যে কোনো রকমের অসাবধানতা বা অপ্রাসঙ্গিক দ্রুততার ফল কত মারাত্মক হতে পারে, তাও তার অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, তার স্থির লক্ষে তিনি ছিলেন অটল, অনড়। একবার তাকে বলা হয় তার স্ত্রী পুত্রকন্যার কোনো হদিস যদি তিনি দিতে পারেন তাহলে তাদের আনবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন, বাংলাদেশের লাখ লাখ পরিবারের যে ভাগ্য তার পরিবার সেই ভাগ্যেরই অংশীদার হবে, তাদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাংলাদেশ প্রকৃত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সহজ ও সরলভাবে দিন কাটাবেন, গার্হস্থ্য জীবন পরিহার করবেন। শেষ দিন পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তার পরিবার এক সময় কলকাতায় এসে পৌঁছালে তিনি কোনোদিন তাদের দেখতে যাননি। একদিন তার শিশুপুত্র অত্যন্ত অসুস্থ। বাঁচার আশা খুব কম। ঘোরের মধ্যে বাবাকে ডাকছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বাবাকে আনিয়ে নিতে। প্রতিজ্ঞায় অটল তাজউদ্দিন সাহেব যেতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে ডেকে পাঠানো হল। অনেক বুঝিয়ে বলার পর তিনি যেতে রাজী হলেন। পুত্রের শিয়রে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে নীরব প্রার্থনার পর নিঃশব্দে ফিরে এলেন। বিধাতার অসীম করুণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভার ন্যস্ত হয়েছিল এমন একজন নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ বীরের হাতে। কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাজউদ্দিন সাহেব তার সহজ ও সরল যুক্তির জোরে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। কয়েকজন যুবনেতা বিক্ষুব্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রতিযোগী মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং কিছু দিশাহারা আমলার সাহায্যে অধিকতর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ে সমর্থ হন। তাদের একজন তাজউদ্দিন সাহেবের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পিস্তল হাতে অতর্কিতে তার ঘরে ঢোকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। তাজউদ্দিন সাহেব তাকে ক্ষমা করে নিজের বিশ্বস্ত অনুগামী করে তুলতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে তাজউদ্দিন সাহেব ছিলেন নিঃসঙ্গ সেনানায়ক। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং কর্নেল ওসমানী সাধারণত তাকে সমর্থন করতেন তবে কেউই তার মতো নিবেদিত প্রাণ ছিলেন বলে মনে হয়নি। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলেরই প্রখর দৃষ্টি ছিল, শুধুমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার স্বাতন্ত্র্য এবং নীতিবোধ তাকে অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এমনকি মাওলানা ভাসানী পর্যন্ত একদিন বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের মধ্যে মানুষের মত মানুষ ওই তাজউদ্দিন'।

এদিকে আওয়ামী লীগের ভেতরের এক অংশ এবং বাইরের শক্তির সহযোগিতায় প্রবল চেষ্টা চলছিল আওয়ামী লীগের প্রতিপত্তি খর্ব করে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের।

তাজউদ্দিন সাহেব এই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। ভাসানী সাহেব তাকে সমর্থন জানান এই বলে যে, 'বাংলাদেশের জনগণ যাদের একজনকেও নির্বাচিত করেনি তারা কোন দাবিতে মন্ত্রীর পদ অধিকার করবে।' শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টায় এই অভিসন্ধির শেষ হয়। তিনি তাজউদ্দিন সাহেবের যুক্তিতে সায় দেন। শুভ বুদ্ধির জয় হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর যেদিন মন্ত্রীরা ঢাকায় ফিরে যান (২১শে ডিসেম্বর ১৯৭১) সেদিন রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দমদম বিমানবন্দরে যাই তাদের বিদায় জানাতে। নানা ব র পর রুস্তমজী সাহেব বলেন, 'আমরা আশা করবো ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে।' সঙ্গে সঙ্গে তাজউদ্দিন সাহেব জবাব দেন 'হ্যাঁ, স্বাধীন বাংলাদেশের উপর যদি কোনো চাপ সৃষ্টি না করা হয়, বাংলাদেশের কাজকর্মে যদি কোনো প্রভাব বিস্তার না করা হয় তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন ভারতের মৈত্রী চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবে।' যে রুস্তমজীর চেষ্টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ এবং যার সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক, স্বদেশের স্বার্থে তাকেও স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব জানাতে তাজউদ্দিন সাহেব মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করলেন না। অথচ বাংলাদেশে প্রচার করা হল তিনি ভারতের দালাল। মিথ্যা কি চিরদিন সত্যের কণ্ঠরোধ করে রাখবে?

যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ কোথায় অনুমান করা যাচ্ছে না সেই রকম একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন নববর্ষ ঢাকাতে উদযাপন করব। নববর্ষের দিন ঢাকা সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি কেক, মিষ্টি, চা প্রভৃতি খাইয়ে আমাকে এবং আমার কন্যা জয়ন্তীকে আপ্যায়ন করেন। আমাকে আমার সেই আগের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তার কোমল স্নেহার্দ্র ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। আমার দুই কন্যার বিবাহে তার পরিবারের সাহচর্য লাভ করি। জীবনের যখন চরম আঘাত আসে, ঈশ্বর আমার পত্নীকে চরণে স্থান দেন, তখনো তাজউদ্দিন সাহেব ছুটে এসে সমবেদনা জানিয়ে যান। এ তার মহত্ত্বেরই পরিচয়।

তাজউদ্দিন সাহেব মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো তাকে নানা প্রলোভন দেখিয়েছে। সামরিক বাহিনীও তার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তার সুস্পষ্ট উত্তর ছিল 'শেখ সাহেবের নেতৃত্বে যেকোনো পরিবর্তনের প্রয়াসে তিনি যুক্ত হতে প্রস্তুত, তাকে বাদ দিয়ে কোনো পরিবর্তনের কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না।' সমস্ত প্রলোভন তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন। এর জন্য চরম মূল্য দিতেও তার দ্বিধা ছিল না।

মনে হয় তার নীতিবোধ ও নেতৃত্বকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা তখন বাংলাদেশের ছিল না। গভীর মানবিকতা, উজ্জ্বল আদর্শবান, নিপূণ কর্মপ্রণালি, মূল্যবোধের মাহাত্ম্য, অকপট আচরণ, সারল্য ও সহনশীলতা তার নির্লোভ নিরাসক্ত হৃদয়কে এক অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছিল। তার প্রতিভা ও চরিত্র গরিমার দীপ্তিতে যাঁরা ম্লান হয়ে পড়েছেন তারাই ঈর্ষা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার চরিত্র হননের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু

প্রভাত সূর্যের আলোর মতোই সত্য দিক দিগন্তে ছড়িয়ে সমস্ত কুয়াশা, সকল অন্ধকার দূর করে দেবে। দেশবাসীও এই দেশভক্ত সন্তানকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে স্মরণের অমরতায়।

০২-০৭-১৯৯৫

**গোলক মজুমদার**
১৯৭১ সালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (BSF)-এর Inspector General, West Bengal ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় সরকারিভাবে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
[সূত্র : সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদনা), তাজউদ্দিন আহমেদ-আলোকের অনন্তধারা, প্রতিভাস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৩৩-২৪১।]

# মুক্তিযুদ্ধে আর্মি মেডিকেল কোরের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন চিকিৎসক। আমি বিখ্যাত আগরতলা মামলার একজন আসামীও বটে। মুক্তিযুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মেডিকেল সাপোর্ট। বাংলাদেশের ইতিহাস আংশিক ও অনাবৃত থাকবে যদি এই সাপোর্টের কথা অজানা থেকে যায়। যুদ্ধের সময় আমার বয়স, সেনাবাহিনীতে আমার জ্যেষ্ঠতা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৪ সালের রান অফ কাচ্চ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধসহ মোট ৪টি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং চিকিৎসা পেশায় আমার সম্পৃক্ততার জন্য দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনার সূত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে আমি অবহিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পৃক্তও।

শৈশব থেকে সব সময়ই মনে হত যে, যদি আমাদের একটা আলাদা, শান্তিপূর্ণ সুন্দর, শ্যামল আনন্দময় দেশ থাকত। ১৯৫২ সালে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশুনা করি এবং আর দশজন ছাত্রের মতো আমি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোর-এ কমিশন লাভ করি। আগে থেকেই বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা আমার মনকে বিচলিত করে এবং সবসময়ে আমার দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তর করার ইচ্ছা জাগ্রত হতে থাকে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ পিএনএস জাহাঙ্গীর এর কমান্ডিং অফিসার কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সাথে পরিচয় হয় এবং তার সঙ্গেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকায় জড়িয়ে যাই। ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা বাতিল হওয়ার পরে আমরা যারা সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরিরত ছিলাম তাদেরকে সামরিক বাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। আগরতলা মামলার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে সৌহার্দ গড়ে উঠে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর সবসময় এই ধারণা মনে গাঁথে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। জানুয়ারি ১৯৭১-এ ঈদের দিন ধানমণ্ডির ৩২নং বাসায় বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে উনি আমাদেরকে তথা আগরতলা বিপ্লবীদের জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাদের পুরনো সামরিক পোশাক রেডি আছে কিনা। তার এ প্রশ্নে মনে দৃঢ়ভাবে দানা বাধে যে, দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম হবে এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা দেশ স্বাধীন করার চূড়ান্ত রায় বলে মনে হল।

মার্চ একাত্তরে আমি ঢাকায় লালবাগ কেল্লার কাছে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে থাকতাম। ২৫ তারিখ রাত ১২টায় গোলাগুলির শব্দ ও লালবাগের পশ্চিম উত্তর দিকে ভয়ানক আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বুঝলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনী অগ্নিসংযোগ করেছে। রাত ২টার পরে একটু নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। সকাল ৮ টায় লালবাগের বাসায় একজন এসে বলল যে, কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে এবং সে আমাকে শীঘ্র আমার বাসা ত্যাগ করে চলে যেতে বলে। ২৬শে মার্চ বিকালেই বৃদ্ধ মা, বোন, স্ত্রী, ভাই ও ভ্রাতৃস্পুত্রদের নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে কামরাঙ্গীর চরে আমাদের গোয়ালার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করি।

২৮ তারিখে কামরাঙ্গীর চর আমাদের কাছে অরক্ষণীয় মনে হয়, কেননা পাকিস্তানি একটি গানবোট নদীতে টহল দিচ্ছিল। ইতোমধ্যে জানাজানি হয় যে, আমি সেনাবাহিনীর অফিসার। ২৯ তারিখে কেরানীগঞ্জের মাঠে কয়েকজন ছাত্র একটা এলএমজি যোগাড় করে আমাকে তার ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমি তাদেরকে তা দেখিয়ে দেই। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ডিজিএমএস মেজর জেনারেল মইদ সিদ্দিকও ছিলেন। তখন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। রামেরকান্দা গ্রামের এক বাড়িতে আমরা পুরো পরিবারসহ আশ্রয় গ্রহণ করি। ১লা এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা কেরানিগঞ্জ আক্রমণ করে একরূপ ধ্বংস করে দেয়। আমি আগলা গ্রামের জনৈক মতি মেম্বরের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখানকার লোকজন আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হয় এবং আমাকে অনুরোধ করে আশপাশের গ্রামের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। অল্প সময়ে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা আমি করতে থাকি। কারণ তখন মনে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হলে পাক বাহিনীকে চলার পথে মাঝেমধ্যে বাধা বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও আমাদের একজনের কাছে একটা রাইফেল ছিল, প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তাই তখন যথেষ্ট মনে হতো। সেখান থেকে এপ্রিল মাসে ১০০ জনের একটা দলকে আমরা কলকাতায় পাঠাই প্রশিক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য। মে মাসের প্রথমদিকে মেজর খালেদ মোশারফের চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে বর্ডার ক্রস করে ভারতে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে বল্লেন। দুই তিন বার চেষ্টার পরে অবশেষে আমি আমার ভাইয়ের সাথে আগরতলা ডেল্টা সেক্টর (ভারতীয়) হেডকোয়ার্টারে যোগদান করি।

বাংলাদেশ মেডিকেল কোরের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ অফিসার স্কোয়াড্রন লিডার সামসুল হক ২২শে এপ্রিল ঢাকা ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগরতলা পৌঁছান। এসময় বেসামরিক ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ডাক্তার ও ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। তখন অবশ্য নানা অবস্থান থেকে ডাক্তাররা মেডিকেল ছাত্র, নার্সরা যুদ্ধাহতদের বিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১নং সেক্টরে আমি মেজর খুরশিদ, লে. রেজা, ২নং সেক্টরে ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন, ক্যাপ্টেন আখতার ও ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম, ৩নং সেক্টরে লে. আহমেদ আলী লে. মইন উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন কামাল, ৬নং সেক্টরে ক্যাপ্টেন মোশাহেব, ৭নং সেক্টবে মেজর মকসুল পাক বাহিনী ত্যাগ

করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমিও অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারের মতো সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দিব। কারণ ইতোপূর্বে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ ও রান অব কাচ্চসহ দুটি যুদ্ধে অগ্রবর্তী লাইনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি। এ দুটি যুদ্ধে কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কিন্তু দেখলাম আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অপেক্ষা করছে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার তখন প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। চিকিৎসা না পেলে যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে যাবে। আহতদের করুণ অবস্থা দেখলে অন্য যোদ্ধাদের আক্রমণাত্মক ও সাহসী ভূমিকার ভাটা পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই সিদ্ধান্ত নেই মেডিকেল সাপোর্ট ব্যবস্থা সংগঠিত করার।

ইতোপূর্বে ক্যাপ্টেন লতিফ মল্লিক, ক্যাপ্টেন আবেদ, ক্যাপ্টেন মো. শাহজাহান, ক্যাপ্টেন মুজিবুর রহমান ফকির, ডা. বড়ুয়া, ডা. জাফর সাদেক, ডা. নাজিম, ডা. বেলায়েত, ডা. গোফরান, ডা. মুস্তাফিজ বিভিন্ন সেক্টরে যোগ দেন। মেডিক্যালের ছাত্র আলী আকবর, আবুল কালাম আজাদ, আবেদুর রহমান, বিভিন্ন সেক্টরে যোগ দেন। এছাড়া আরও অনেক বেসামরিক ডাক্তার, ছাত্রছাত্রী ও সিভিলিয়ন নার্স যোগ দেন। এরা তখন সামান্য কিছু ঔষুধ, তুলা ও ব্যান্ডেজ দিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতে থাকেন। জুন মাসে ক্যাপ্টেন আখতার সোনামুড়া নামক স্থানে একটি ছোট হাসপাতাল খোলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিতে থাকেন। সেটাই হল আমাদের প্রথম হাসপাতাল। পরে সেই হাসপাতাল বিশ্রামগঞ্জে হাবুল ব্যানার্জীর লিচু বাগানে স্থানান্তর করে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। এ হাসপাতালই মেজর খালেদ মোশারফের তত্ত্বাবধানে ও ক্যাপ্টেন আখতার, ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম এবং অন্যান্যদের পরিশ্রমে একটি ২০০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। ইতোপূর্বে ইংল্যান্ড থেকে প্রখ্যাত সার্জন ডা. মোবিন, ডা. জাফরুল্লাহ প্রমুখ এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। তাদের এবং ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও ভারতীয় কিছু ডাক্তারের সহযোগিতায় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপ নেয়। এখানে আহতদের অপারেশেনসহ নানা বোগের চিকিৎসা করা হয়। এ হাসপাতালের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে গোপনে সরবরাহ করা হয়। গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি বি (গোবিন্দ বল্লভ) হাসপাতালে পাঠানো হত এবং ওষুধপত্র সংগ্রহ করা হত সেখান থেকেই। এখানে সিভিলিয়ন নার্সরা ও দেশের গণ্যমান্য এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী ও কন্যারা যেমন খুকু, সুফিয়া কামালের মেয়ে লুলু, টুলু, কর্নেল নুরুজ্জামানের মেয়ে মিনু ও শিমুল বিল্লাহসহ আরও অনেকে যোগদান করে এবং এদের চিকিৎসায় আহতরা খুব দ্রুত আরোগ্যলাভ করে এবং যুদ্ধে ফেরত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন, কর্নেল ওসমানী, ডা. টি হোসেন ও ভারতীয় উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারেরা ১নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার (হরিনা) পরিদর্শনে আসেন এবং সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকের সাথে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেদিন ছিল

ঝড়ের রাত। সে রাতে টিনের চালার ঘরে কেরোসিন বাতির আলোয় পেন্সিল দিয়ে লেখা কাগজে আমি আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল কোর-এর অর্গানোগ্রাম তাদের সামনে উপস্থাপন করি। এতে বাংলাদেশ মেডিকেল কোর-এ ডিজিএমএস এবং তার অধীনে যথাক্রমে এডিএমএস (ইস্টার্ন সেক্টর), এডিএমএস (ওয়েস্টার্ন সেক্টর), এডিএমএস (স্টোর) এই ৩টি দফতর রাখা হয়। কর্নেল ওসমানীর এ অর্গানোগ্রামটি অত্যন্ত পছন্দ হয় এবং উনি প্রস্তাবের কাগজটি সাথে দিয়ে যান। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে কলকাতার থিয়েটার রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে বাংলাদেশ আর্মি মেডিকেল কোরের অর্গানাইজেশন-এর অর্ডার বের হয়। বাংলাদেশ সরকারের অন্য এক আদেশে মেডিকেল এডমনিস্টেশনের ক্ষেত্রে সকল সেক্টরকে ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন সেক্টরের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। কোয়াড্রন লিডার শামসুল হক ডিজিএমএস এর দায়িত্বে নিয়োজিত হন। আমাকে ইস্টার্ন সেক্টরের এবং মেজর সামসুল আলমকে ওয়েস্টার্ন সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। এডিএমএস (স্টোর) এর দায়িত্ব একজন বেসামরিক কর্মকর্তাকে দেয়া হয়। এখন আমার উপরে ১ থেকে ৫ নম্বর সেক্টরের সকল মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেশনের ভার পড়ে এবং বিশ্রামগঞ্জে বাংলাদেশ হাসপাতাল আমার অধীনে ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেডিকেল কলেজের খ্যাতনামা প্রফেসররা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, ওষুধ ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি গোপনে প্রদান করতেন। উল্লেখ্য, প্রফেসর আলিম চৌধুরী, প্রফেসর ফজলে রাব্বি, ডাঃ মুর্তজা (১৪ ডিসেম্বর আল বদরদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন) সহ অনেক সিনিয়র/জুনিয়র প্রফেসর হাসপাতাল থেকে গোপনে যন্ত্রপাতি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমাদের হাতে পৌছাতেন। এক্ষেত্রে ডা. আজিজ ও সুলতানা আজিজের নাম মোটেও ভুলবার নয়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে যে সমস্ত মেডিকেল ষ্টুডেন্ট আমাদের হাসপাতালে কাজ করত তারা অদম্য স্পৃহায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধে চলে যায়। রোগীরা কেউই হাসপাতালে রোগী হয়ে থাকতে চাইত না। সকলেই অস্ত্র হাতে যুদ্ধে চলে যেত। এমন মানসিক অবস্থা ছিল রোগী এবং চিকিৎসকদের।

৫টা সেক্টর ও বাংলাদেশ হাসপাতাল আমার অধীনে হওয়ায় কাজ অধিকমাত্রায় বেড়ে যায়। প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কাছ থেকেও অনেক প্রেসক্রিপশন ও ডিমান্ড পেতাম ওষুধ দেয়ার জন্য। আমার ইস্টার্ন হেডকোয়ার্টার, আগরতলা ডেল্টা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে অবস্থিত ছিল। মেডিকেল স্টোর থেকে ডিমান্ড দিয়ে ওষুধ ও যন্ত্রপাতি অতি সহজেই পেতাম। এ পর্যায়ে আমাদের ওষুধের কোনো ঘাটতি ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে। বিশেষ করে খালেদ মোশারফের নিয়ন্ত্রণাধীন ফোর্সের আক্রমণ পাক হানাদার বাহিনীর মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এ আক্রমণের ধরণ ছিল আঘাতের পর আঘাত। ফলে একদিকে পাকহানাদার বাহিনীর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেমন দারুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও বেশ বেড়ে যায়। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাইনর ও মেজর অপারেশন, রক্তসঞ্চালন, বুলেট, স্প্লিন্টার অপসারণ, যাবতীয় জরুরি চিকিৎসার চাপ দিন দিন প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে

সাথে চিকিৎসাসহ সরঞ্জামাদি বিশেষ করে রক্ত, জরুরি ওষুধ, গজ ব্যান্ডেজ, ব্যথানাশক ওষুধ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সব কিছুতেই হতো আমার নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের মাধ্যমে। তার উপর গুরুতর কেসগুলোকে ভারতীয় হাসপাতালে স্থানান্তর কাজটিও করতে হতো, যা ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। সব কিছুই আমাদের সামাল দিতে হয়েছে, যা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে হিমশিম খেতে হয়েছে। অনেক কষ্ট হয়েছে এগুলো করতে কিন্তু কখনও কাজ বন্ধ করিনি। কারণ আমাদের কষ্টের চেয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানো ও দ্রুত আরোগ্য করে পুনরায় যুদ্ধে পাঠানোর দাবি ছিল আমার কাছে অনেক বড়।

চট্টগ্রামের মদুনাঘাট অপারেশনে ফ্লাইট লেফটেনেন্ট সুলতান মাহমুদ অতি দক্ষতার সাথে ৩রা অক্টোবর ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার ও অনেক পাইপ ধ্বংস করেন। সুলতান ঐ অপারেশনে পাহাড় থেকে নিচে পড়ে মারাত্মক আহত হন। টিংচার আয়োডিন দিয়ে জখমগুলো পরিষ্কার করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। প্রতিটি ক্ষতস্থানে সেল ই ও ঔষধ লাগানোর সময় সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।

৫/৬ নভেম্বর বিলোনিয়া দখল নিয়ে বিখ্যাত যুদ্ধ হয় পাকিস্তনিদের সাথে। এ যুদ্ধে মূল আক্রমণের দায়িত্ব ছিল ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। ভারতীয় ২ রাজপুত রেজিমেন্ট এ যুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করে। বিলোনিয়া যুদ্ধের সময় ২ রাজপুত রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল দত্ত তার সেনাদলের জন্য আমার কাছে মেডিকেল কভার চাইলে অত্যন্ত খুশিমনে আমি নিজেই অংশগ্রহণ করি। প্রচণ্ড যুদ্ধে যৌথবাহিনীর কাছে বিলোনিয়া পতন হয়। মুক্ত বিলোনিয়া পদচারণা করতে ভীষণ উৎফুল্ল বোধ করছিলাম।

৬ ডিসেম্বর সকালেই রেডিওতে সংবাদ পেলাম যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইতোপূর্বে দুষ্ট লোকের বলত যে, আমাদেরকে ভারতের করদরাজ্য হয়ে থাকতে হবে কিন্তু এ স্বীকৃতির পর ঐ শঙ্কা আর রইল না, আমরা একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেলাম এবং নিন্দুকের মুখ বন্ধ হল।

হঠাৎ করে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৩টায় কর্নেল ওসমানী সিলেট এলাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হয়তবা তার নিজের জেলা ও নাড়ির টানে। তিনি আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে ভারতীয় হেলিকপ্টারে উঠলেন। সাথে ছিল ভারতীয় লিয়াজো অফিসার ব্রিগেডিয়ার উজ্জল গুপ্ত, লে. কর্নেল রব ও লে. শেখ কামাল। বিকাল ৫টার সময় হেলিকপ্টার নিচু হয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা রাইফেল দিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে গুলি করে। একটা গুলি কর্নেল রবের উরুতে বিদ্ধ হয়। আর একটা গুলিতে হেলিকপ্টারের অয়েল ট্যাংক ছিদ্র হয়ে গেলে তেল চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। পাইলই একটু দূরে ছোট মাঠে হেলিকপ্টারটি নামায়। গ্রামের লোক ছুটে এসে কর্নেল রবকে গ্রামের একটি ছোট বাড়িতে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। পরদিন ১৭ই ডিসেম্বর আহত কর্নেল রবকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি আগরতলায় ল্যান্ড করে। কর্নেল ওসমানী নেমে এসে আমাকে বলেন, 'ডক, টেক কেয়ার

অফ রব, আই এম গোয়িং', বলেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এ সময় শেখ কামাল আমাকে শুধু বলল, 'স্যার, পড়েছি মোগলের হাতে', এই বলে এডিসি লে. শেখ কামাল ওসমানীর সাথে যাত্রা করে। কর্নেল রবকে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সে করে আগরতলা হাসপাতালে নিয়ে যাই। এক্স-রে করে বুলেট পাওয়া যায়নি অথবা হাড়ের ইনজুরিও পাওয়া যায়নি। বুলেটটা উরু ভেদ করে বের হয়ে গিয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা কর্নেল রবকে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রেখে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসি।

৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বাহিনীর ডিজিএমএসএর একটি পোস্টিং অর্ডার বের হয়, যাতে এএমসি-র অফিসার ও অন্যান্য পদবীর ১৫০ জনের পোস্টিং অর্ডার লিপিবদ্ধ ছিল। ১১ তারিখে ভারতীয় অফিসাররা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, 'দেশ এখনও স্বাধীন হল না, যুদ্ধ শেষ হল না, এর মধ্যেই তোমাদের এ পোস্টিং অর্ডার। তবে তোমাদের এই দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করাই যায় না'। আমাকে অবিলম্বে সিএমএইচ কুমিল্লা এর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে টেকওভার করতে বলা হল। ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম একটি সাদা গাড়ি নিয়ে কুমিল্লায় যাই। সেখানের সিএমএইচ এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর ১০১ ফিল্ড হাসপাতাল টির অবস্থান ছিল। আমি এক রকম দখল করে ফেলি এবং কুমিল্লা সিএমএইচ নামে এর কার্যক্রম শুরু করি।

কুমিল্লা সেনানিবাসের ইস্পাহানী কলেজে ভারতীয় ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছিল। স্কুলের মাঠে দেখি পাকিস্তানি সেনারা মাঠের ঘাস কাটছে। তাদের চোখ-মুখ খুব বিরক্তিতে ভরা। ভারতীয় কয়েকজন সৈনিক তাদের পাহারা দিচ্ছে। আমাকে দেখে তারা প্রশ্ন করে যে তারা যুদ্ধবন্দি এবং এই কাজ তাদের দিয়ে কেন করানো হচ্ছে। তখন আমি পাক বাহিনীর নৃশংসতার কথা স্মরণ করে ঘৃণার সাথে মাটিতে থুথু ফেলি। ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিংয়ের সাথে দেখা হল। তার সাথে পূর্ব পরিচিত ছিলাম। তাকে আমাদের পার্ট-১ অর্ডারটা দেখালাম। উনি ভারতীয় এডিএমএস এর সাথে কথা বললেন এবং এক ঘন্টা পরে আমাকে একটা চিঠি দিলেন যাতে পুরো সিএমএইচকে মেজর খুরশিদের (আমার) কাছে হস্তান্তর করার আদেশ দেয়া আছে। এ আদেশের সুবাদে আমি ভারতীয় কর্নেল কাদুয়ার কাছে থেকে সিএমএইচ এর দায়িত্ব বুঝে নেই।

কুমিল্লায় বাংলাদেশ হাসপাতালের সব সৈনিক, নার্সরা আমার এখানে কাজে যোগদান করতে থাকে। পাক আমলে পালিয়ে যাওয়া মালি, সুইপার ও অন্যান্য নানা পদের লোকজনও কাজে যোগ দেয়। হাসপাতালের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক করতে মেজর আখতার ও ক্যাপ্টেন আহমদ আলী প্রচুর পরিশ্রম করেন। এ সময় অফিসার্স মেস শুরু করা হয়। অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মেস পরিচালিত হতে লাগল। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল যে, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। ২৬শে মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় বাহিনীর সমস্ত সৈন্যরা বাংলাদেশের জমি ছেড়ে চলে গেল। ভারতীয় অফিসাররা যুদ্ধকালে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো, যেটা পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে পাকিস্তানের ২৩ বছরের চাকরি জীবনে পাইনি।

জেড ফোর্স পূর্বের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার এলাকায় স্থাপিত হলো। কর্নেল জিয়া ওখানেই তার দাফতরিক কাজ শুরু করলেন। ১লা এপ্রিল ৭২-এ আমি পদোন্নতি পেয়ে লে. কর্নেল র‍্যাংক লাগালাম। জেড ফোর্সের কমান্ডার কর্নেল জিয়া একদিন আমাকে ডেকে বললেন, কুমিল্লা সেনানিবাসে অনেক লোককে পাকিস্তানিরা মেরেছে। গণকবরগুলো সনাক্ত করে লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। দুই একদিন পরেই প্রায় এক কোম্পানি সৈনিক নিয়ে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের পেছনে একটা ছোট মাঠে কাঁচা জমি দেখে খোদাই শুরু করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম একটার পর একটা লাশ উঠে আসছে। এটা ছিল একটা গণকবর। এই গণকবর থেকে আর্মি মেডিকোল কোরের লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর, লে. কর্নেল ইসলাম, মেজর হাসিব, মেজর জামান, ক্যাপ্টেন বদিউল, ক্যাপ্টেন ফারুক, ক্যাপ্টেন তারেক, ক্যাপ্টেন খালেকসহ অনেকের লাশ উদ্ধার করা হয়। লে. কর্নেল জাহাঙ্গীরের লাশ অক্ষত অবস্থায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ঘড়িতে ৩০শে মার্চ তারিখ দেখাচ্ছিল। কুমিল্লা সিএমএইচ-এর কমান্ডিং অফিসার থাকাকালীন তাকে ঐ দিন ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে গুলি করে মারা হয়। মেজর হাসিবকে তার স্ত্রী ও কন্যার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেনি, মেজর হাসিবের মেয়ে তার ঘরের দেয়ালে লাল কালিতে লিখে গিয়েছিল, "বাবা আমরা চলে যাচ্ছি। তুমি ফিরে এসে যদি আমাদের না পাও তাহলে দুঃখ করো না।" দেশ স্বাধীনের পর আমি মেজর হাসিবের লাশ তাদের হাতে তুলে দেই। বাকি সকলের লাশ টিপরাবাজার এমপি চেকপোস্টের সামনে সামরিক রীতি অনুসরণ করে দাফন করা হয় এবং পরবর্তীতে এর পাশে স্বাধীনতা যুদ্ধের মনুমেন্ট ও মিউজিয়াম তৈরি করা হয়। দাফনের সময় প্রতিটি শহীদের সম্মানে আকাশে ২১ বার ফায়ার করা হয়। প্রতি দাফনের সময় সকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। দু'জন মেডিক্যাল অফিসারের লাশ তাদের দুজনের বাবা ও মায়ের ইচ্ছায় একই কবরে সমাহিত করা হয়। চাকুরি জীবনে তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের জীবন হরণ করেছে একত্রে। একটি স্মৃতিফলকে তাদের দুজনের নাম একত্রে লেখা হয়। একটা ছোট পাহাড়ের টিলায় মেজর গণির (যিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা) কবর ছিল। সেখানে একটি কাঁচা কবরে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বোখারীর মৃতদেহ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কুখ্যাত, নৃশংস, অত্যাচারী এই পাকিস্তানি অফিসারের নামে কুমিল্লা শহর কেঁপে উঠত। তার অত্যাচারের মাত্রা এতই তীব্র ছিল যা কুমিল্লাবাসীরাই জ্ঞাত ছিল। মুক্তিবাহিনী তাকে নভেম্বর মাসে এম্বুশ করে হত্যা করে। তার কবরের সংবাদ পেয়ে কুমিল্লাবাসী দাবি জানায় যে, এই ঘৃণ্য অত্যাচারীর লাশ যেন বাংলার মাটিতে না থাকে। জেনারেল ওসমানীকে আমি এ খবর দেওয়ার পর তিনি আদেশ দিলেন, এ অত্যাচারীর লাশ সমুদ্রে ফেলতে। ক্যাপ্টেন বোখারীর মৃতদেহ উঠিয়ে একটা ছোট কাঠের বাক্সে ভরে চট্টগ্রামের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। কুমিল্লায় যে কত শহীদের লাশ খুড়ে বের করি তার হিসাব নিরূপণ করা সহজসাধ্য ছিল না।

বাহাত্তরের মে মাসে কর্নেল জিয়াকে জার্মানি পাঠানো হয়। তিনি সেখানে পরখ করবেন ট্রেনিংয়ের জন্য সেদেশের ইউনিফর্ম আমাদের আর্মিতে উপযুক্ত কিনা। তিনি সেনাসদরের আদেশে জেড ফোর্স-এর দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে যান। এর পর সেনাসদরের এক আদেশে জেড ফোর্সকে ৪৪ ব্রিগেড রূপান্তরিত করি। এসময় ব্রিগেড মেজর ও ডিকিউ-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন যথাক্রমে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, বীর বিক্রম ও ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম। এরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত, দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাদের নিরলস সহযোগিতায় এই নতুন ব্রিগেড কমান্ড করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। এ সময় তিনটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর এটেস্টেশন প্যারেড সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়। কর্নেল জিয়া জার্মানি থেকে ঢাকায় ফেরার পর এসে সরাসরি উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

এ সময় জানতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো একটি সেনানিবাস পরিদর্শন করবেন। যে কারণেই হোক তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ব্রিগেড কুচকাওয়াজ ও সেনানিবাস প্রদর্শণের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কারণ, এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বপ্রথম সেনানিবাস পরিদর্শন। তার আগমন উপলক্ষে কুমিল্লা সেনানিবাস ও তদসংলগ্ন এলাকা রাস্তায় সাজ সাজ ভাব পড়ে যায়। এসময় লে. কর্নেল তাহের নতুন কমান্ডার হিসেবে পোস্টিং পেয়ে কুমিল্লায় উপস্থিত হন। আর ঢাকা সিএমএইচ-এর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে আমার পোস্টিং অর্ডার বের হয়। আরও ১০ দিন পর বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস পরিদর্শন করবেন। সেনাসদর থেকে উপ-সেনাপ্রধান কর্নেল জিয়া আমাকে এক আদেশে জানালেন প্যারেড সমাপ্ত হওয়ার পরই যেন লে. কর্নেল তাহেরের কাছে আমি দায়িত্ব হস্তান্তর করি।

১৯৭২ সালের ৬ই জুনের প্রত্যুষে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে পুরো ব্রিগেডের সদ্য যুদ্ধ ফেরত দামাল সন্তানদের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকেরা রাষ্ট্রপতিকে প্রথম কুচকাওয়াজ প্রদর্শণে প্রস্তুত হয়। বঙ্গবন্ধুর পিছনে সেনাপ্রধান কর্নেল শফিউল্লাহ, আমি ও উপ-সেনাপ্রধান কর্নেল জিয়া ডায়াসে অবস্থান নেই। প্যারেড কমান্ডার বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কুচকাওয়াজ শুরু করার অনুমতি নিয়ে মার্চ শুরু করেন। ব্যান্ডের তালে তালে দৃপ্ত পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। পেছন থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর অনুভূতি টের পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল গর্বে ওনার বুক ফুলে যাচ্ছে। পুলকিত নেত্রে দেখছিলেন বাংলার এই বীরদের। তিনি অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং নিপীড়িত জনগণের গৌরবময় ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। প্যারেড শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার সাথে হাত মিলালেন ও উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। পরদিন লে. কর্নেল তাহেরের কাছে ৪৪ ব্রিগেডের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকার পথে রওনা হই ও ঢাকা সিএমএইচ এর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে যোগদান করি।

সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদত বরণকারী আর্মি মেডিকেল কোর-এর অফিসারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ১৫ জন অফিসারের মধ্যে ৪ জন লে. কর্নেল, ৫ জন মেজর, ৬ জন ক্যাপ্টেন ও লে. পদবীধারী ডাক্তার। অন্য কোনো কোরের এতজন লে. কর্নেল শহীদ হননি। অফিসারদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েচেন

লে. কর্নেল বদিউল আলম চৌধুরী, লে. কর্নেল সৈয়দ আবদুর হাই, লে. কর্নেল এএনএম জাহাঙ্গীর, লে. কর্নেল এ এফ জিয়াউর রহমান, মেজর আসাদুল হক, মেজর নাইমুল ইসলাম, মেজর রেজাউর রহমান, মেজর মুজিব উদ্দিন আহমেদ, মেজর আমিরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আবুল কালাম শেখ, ক্যাপ্টেন বদিউল আলম, লে. এনামুল হক, লে. এম ফারুক, লে. নুরুল ইসলাম তূর্কী, লে. মো. আমিনুল হক।

জেসিও ও অন্যান্য র‍্যাংকের ১৩১ জন শাহাদত বরণ করেন, যার মধ্যে ১ জন বীর উত্তম, ৩ জন বীর বিক্রম ও ১ জন বীর প্রতীক উপাধিধারী। মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের সঙ্গে মেডিক্যাল কোরের সদস্যরা সমান তালে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে মেডিক্যাল কোরের পাঁচ শতাধিক অফিসার জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকেরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন। যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য এই কোরের ১০ জন সদস্যকে বীরত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা হয়। এরা হলেন :

শহীদ সিপাহী নুরুল হক, বীর উত্তম
শহীদ হাবিলদার মোঃ রুহুল আমিন বীর বিক্রম
শহীদ ল্যান্স নায়েক মো. দেলোয়ার হোসেন বীর বিক্রম
শহীদ সিপাহী মো. জামাল উদ্দিন বীর বিক্রম
শহীদ সিপাহী ফারুক আহমেদ পাটোয়ারী বীর প্রতীক
সুবেদার গোলাম মোস্তফা খান বীর বিক্রম
সুবেদার মুসলেহ উদ্দিন আহমদ বীর প্রতীক
মেজর আখতার আহমেদ বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ বীর প্রতীক

এখানে ছাত্র ও বেসামরিক ডাক্তারদের অবদানও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। তবুও কিছু গৃহিণী/ছাত্রীর নাম উল্লেখ না করলেই নয়-সুলতানা কামাল, সাইদা কামাল, খুকু, ডালিয়া, পদ্মা, নীলিমা, অনুপমা, আসমা, রেশমা, মিনু বিল্লাহ-এরা সবাই বাংলাদেশ হাসপাতালে নার্স হিসেবে রোগীদের চিকিৎসা দিয়েছে। ডাক্তার ছাত্র নাজিম, শামছুদ্দিন, ফারহান, সেলিম, আবেদ, মাহমুদ, রশিদ, খাজা, কিরণ, জুবায়ের, মনছুর কাসেম, লুৎফর, মোরশেদ ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ডা. মোবিন ও ডা. জাফরুল্লাহ ইংল্যান্ডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গাড়ি বিক্রি করে যন্ত্রপাতি, ওষুধ নিয়ে আগরতলায় এসে আহতদের অপারেশন সম্পন্ন করেন। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। এ সময়

মুক্তিযুদ্ধে আর্মি মেডিক্যাল কোর ও চিকিৎসা সেবকদের কথা না লিখে গেলে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাদের উপর অবিচার করা হবে।

স্বাধীনতার ৪০ বছর পর বয়স বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ায় যুদ্ধকালীন বিভিন্ন সেক্টর ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য দেশপ্রেমিক চিকিৎসক, ছাত্র, ছাত্রী ও নার্স যাদের নাম স্মরণ করতে পারছি না তাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এদের সকলের অবদান কখনই বৃথা যায়নি। বাঙালি জাতি তাদেরকে সবসময় স্মরণ করবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস। যদি কোনো কারণে আমার লেখায় কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা কারও নাম ও কথা বাদ পড়ে গিয়ে থাকে অথবা কেউ দ্বিমত প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাকে জানালে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ অকাতরে জীবন দান করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জিত হয়েছে। নিজেদের অভাব-অনটনের মধ্যেও খাবার দিয়েছে। অসংখ্য মা-বোনেরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার রান্না করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে নিজেরা অভুক্ত থেকেও। দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসকদের গোপনে ডেকে সশস্ত্র যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করিয়েছেন। এজন্য কোনো কোনো সময় তাদের ও চিকিৎসককে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। এসব সাধারণ মানুষের ঋণ শোধ হবার নয়। তাদের দেশপ্রেম ছিল সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধে।

স্বাধীনতার ৪০ বছরে এসে আজ দেখি যে মুক্তিযোদ্ধারা, যারা একটা স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য জীবনের সব মায়া ত্যাগ করে, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, বাবা-মায়ের স্নেহবন্ধনকে ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা এখন দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত এবং সামাজিক লাঞ্ছনায় দগ্ধ হয়ে মানবেতার জীবন যাপন করছে। এতে ভীষণ কষ্ট হয়। টেলিভিশনে এবং খবরের কাগজে আজ যখন দেখতে পাই যে যুদ্ধাকালের শক্ত সবল দুর্দান্ত যুব যোদ্ধাদল আজ বয়সের শেষ প্রান্তে এসে ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনোরকমে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, চিকিৎসার অভাবে পঙ্গুত্বকে বরণ করে কোনো রকমভাবে বেঁচে আছে, বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই বলে তাদের কন্যারা আইবুড়ো হয়ে চোখের সামনে বাড়িতে বসে আছে, রাজাকার যুদ্ধাপরাধীরা দেশের ক্ষমতা দখল করে গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে বিলাসিতার দাপটে ঘুরে বেড়ায়; তখন বিক্ষুব্ধচিত্তে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে এ জন্যই কি আমরা দেশটা স্বাধীন করেছি? এ দুঃখ রাখার কি কোনো জায়গা আছে? যখন চাকরিতে ছিলাম তখন কিছু করার সামর্থ্য ছিল। তখন কর্মহীন মুক্তিযোদ্ধাদের যতটা সম্ভব পুর্নবাসন করেছি। আজ এদের এই অবস্থায় আমি কিছু করতে পারছি না বলে প্রচণ্ড ক্ষোভে আমার মন অস্থির হয়ে যায়। আমার এ অক্ষমতা আমাকে সারাক্ষণ পীড়া দেয়। জীবনের এই করুণ অবস্থায় এই সব অসহায় মুক্তিযোদ্ধারা যখন প্রশ্ন করে-এ জন্যই কি আমরা যুদ্ধ করেছি, দেশটা স্বাধীন করেছি, তখন তার উত্তর দিতে পারি না। কারণ এখন যে কোনো সান্ত্বনা তাদের কাছে উপহাস বই কিছু নয়।

সবশেষে জীবনের এ পর্যায়ে আমার সুখ ও দুঃখ হিসেব করলে মনে হয়, আমি একজন সুখী ব্যক্তি। কারণ সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে মানুষের ও দেশের জন্য কিঞ্চিৎ হলেও কাজ করতে পেরেছি। সর্বোপরি মাতৃভূমিকে মুক্ত করতেও অবদান রাখতে পেরেছি। চাকরি ও অবসরকালে সকল স্তরের মানুষ, সকল পদের সামরিক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ ও বিজয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এটাই আমার জীবনের বড় সুখ। তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনো শেষ হল না-এটা আমার জীবনের বড় দুঃখ। তবুও আশায় আছি যদি নতুন প্রজন্ম আমাদের এই বিবেক দংশনের কষ্ট থেকে রেহাই দেবে। তাহলেই, মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী অগণিত শহীদদের আত্মার প্রশান্তি মিলবে।

**বিগ্রেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ**

জন্ম : ১৯শে মার্চ ১৯৩৩, ময়মনসিংহ। শিক্ষা : ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS পাশ করেন। ১৯শে মে ১৯৫৮ তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আর্মি মেডিকেল কোরে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে মামলায় অব্যাহতির পর মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত মেজর। তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাঞ্চলের অ্যাসস্টান্ট ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসের দায়িত্বে ছিলেন।

ছাত্র জীবনে তিনি বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬-৫৭ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার করোয়ার্ড হিসেবে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

# বদলে গেছে সবাই

## মাহবুব আলম

১.

এই যুদ্ধে বদলে গেছে সবাই, সব কিছু।

যুদ্ধটা সব কিছু পালটে দিয়েছে। ওলোট-পালোট করে দিয়েছে মানুষের অভ্যাস, চিন্তা-চেতনা। পাল্টে দিয়েছে দৈনন্দিন রুটিন। জীবন ধারণ পদ্ধতি। পূর্বের মতো আর কেউই নেই। সবকিছুই এখন পরিবর্তিত। সবাই এখন কেমন আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর। ক্লিষ্ট, শুকনো রোগগ্রস্ত মানুষ। হাসি আনন্দ উবে গেছে। এখন কান্না বড় বেশি স্পষ্ট। অভাব আর রোগ শোক বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। পর্দাটর্দাগুলো উঠে গেছে। লজ্জা শরমের বালাই নেই। লাখ লাখ মানুষ গাদাগাদি শরণার্থী শিবিরে। লাল রঙের তাবুর আচ্ছাদনে। কেঁচোকেন্নোর মতো। সেখানেও আব্রু নেই। নেই বাইরেও।

২.

রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। দু'পাশে ফসলবিহীন মাঠ। মহিলারা বসে গেছেন প্রাকৃতিক কর্ম সারতে। কোথাও একা, গ্রুপসহ অন্যখানে। আপনি একবার তাকাতেই ধাক্কা খাবেন। তাকাবেন না দ্বিতীয়বার। পারবেন না। লজ্জাটা তাদের নয়, আপনার। প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেই হয়। উপায় নেই না দিয়ে। তাতে কে দেখলো না দেখলো তার আসে যায় না। শান্তিকালীন সময়ে এটা ভাবাই যায় না। আড়ালে আবডালে, নিজের লজ্জা ঢেকে চিরদিন এই কাজ করে এসেছে বাঙালি নারী কিন্তু এখন কী? এটা কী? বাধ্যগত পরিবর্তন? সেটা কী ভয়ানক!

৩.

একজন স্কুল মাস্টার বিড়ি সিগারেটের দোকান দিয়েছেন। পঞ্চগড়ের কোনো একটা স্কুলের বিএসসি শিক্ষক। সপরিবারে দেশ থেকে পালিয়েছেন। শরণার্থী শিবিরে সেই অমানবিক পরিবেশের মধ্যে যেতে পারেননি। একটা বাড়ির গোশালায় আস্তানা নিয়েছেন। হাতে সম্বল সামান্য কিছু অর্থ। দ্রুত ফুরিয়ে যায়। রেশন কার্ড হয়েছে, কিন্তু ক্যাম্পে না গেলে তা নাকি বাতিল হয়ে যাবে। বাচ্চা কাঁদে ক্ষুধার জ্বালায়। বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে মায়ের। তারওতো ক্ষুধা প্রচুর। শরণার্থী হয়ে এসে পেট পুরে খাবারই

জুটছে না। বাচ্চা চারটি কাঁদে। সোমত্ত বয়সের ননদ। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাবণ্যময় সেই রূপ হারিয়ে গেছে। মলিন চোখ মুখ। পেটে ক্ষুধা। সামনে ভয়াবহ অমানিশার ডাক। ভীত মাস্টার সাহেব। শেষ সম্বল টাকা কটি দিয়ে তেঁতুলিয়া স্কুল মাঠ লাগোয়া রাস্তাটার পাশে বিড়ি সিগারেটের দোকান দিয়েছেন। একটা টেবিলের ওপর সাজানো পশরা। টুলমতো একটা কাঠের ওপর তিনি বসে থাকেন আর ঝিমোন। পানামা, লেক্স, উইলস্, চারমিনার এইগুলো ভারতীয় সিগারেটের নাম। আর বিড়ির নাম হচ্ছে উড়োজাহাজ, মতিবিড়ি। সঙ্গে দিয়াশলাই। মোমবাতি আগরবাতি সুঁই, সুতো। এগুলোও কিছু আছে।

চলে কি?

তেমন না।

তবে দিয়েছেন কেন দোকান?

কী করবো, শিক্ষক মানুষ, যাইতে পারি না কোথাও।

তাই বলে বিড়ি সিগারেটের দোকান, শিক্ষক হয়ে? যুদ্ধে যাবেন না?

না। উপায় নেই।

পরিবর্তিত মানুষ। বদলে যাওয়া মানুষ, দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসেন মলিন হাসি। যুদ্ধের আগে দাড়ি ছিল না। এখন রেখেছেন পয়সা বাঁচাতে। অদ্ভুত সময়!

৪.

পাকা সড়ক। আসাম-বেঙ্গল হাইওয়ে। সাকাতি থেকে ব্রাঞ্চ রোড মিশেছে যেয়ে হাইওয়েতে। কোন দিকে তাকাবো। মানুষের হাল একই।

রাস্তার ঢালে মানুষ, গাছের তলে মানুষ, খোলা আকাশের নিচে মানুষ, স্কুল ঘরে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ভীড়। বাজার উপচে পড়ছে মানুষের দ্বারা। পেছনে ঘোরতর যুদ্ধ চলে, দখলদারীর। নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যুভয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সামনে পড়লেই হলো। কোনো কারণ নেই সোজাসুজি গুলি। ভীত মানুষ। প্রাথমিক ধাক্কায় হতবিহ্বল। শুধু তাগিদ পালানোর। সীমান্ত পার হতে পারলে মৃত্যু আর পিছু নেবে না।

কিন্তু সীমান্ত পার হলেই তো রিসিপশন জানানোর জন্য কেউ বসে নেই। সবাই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। কোথায় যাবে, কী করবে, কী খাবে কিছুই ভাবতে পারে না শিক্ষিত, সদবংশীয়, স্বচ্ছল মানুষ। মাঝারী গোছের চাকরীজীবী। ব্যবসায়ী কৃষক। দিন মজুর। সবাই একাকার। রাস্তার পাশের বড় আমগাছের ছায়ার তলে আপাতত আশ্রয়। সে তো মাত্র ক'জন, অন্যরা হয়তো কিছুই পায় না। উদোম আকাশের তলে। রোদ বৃষ্টির মাঝে। ঘোরলাগা মানুষ। ভেঙে পড়া অসহায় অবস্থা। চাই রেজিস্ট্রেশন, রেশন কার্ড, একটা তাবু। নিরাপদ আশ্রয়।

কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?

জানি না।

মুক্তিযুদ্ধে যাবেন?

যেতাম, ওদের জন্য সম্ভব নয়।

কী করবেন তাহলে?

দেখি নেতারা কী করেন। মুজিবনগর সরকারের কাছে কাজ নেব। যুদ্ধ সবাইকে করতে হবে তার মানে নেই।

তা ঠিক। কিন্তু কাজ না পেলে। যদি দীর্ঘদিন থাকতে হয়?

তখন দেখা যাবে। এখন দরকার একটা রেশন কার্ড। কোথায় পাওয়া যাবে জানেন?

জানি না।

ভদ্রলোক তখন তাকিয়ে থাকেন অসহায় মানুষের মহাসমুদ্রের দিকে। বললেন, কিছু না হলে ফিরে যাবো দেশে। এপারেও মৃত্যু ওপারেও। তবে দেশের মাটিতে মরতে আপত্তি কী?

আপত্তি কোনো নেই। কিন্তু তিনি কী ফেলে আসা দেশে সহজে ফিরতে পারবেন তার পরিবার পরিজন আর বয়ে আনা লটবহর নিয়ে? মনে হয় না।

৫.

মেয়েটা শুধু কাঁদে। কেন কাঁদে সে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে লাভ নেই। একটি তরুণী মেয়ে, তারতো একটা নিজস্ব গণ্ডি থাকেই। তার পছন্দ অপছন্দ ভালোলাগা, মন্দলাগা। তার রাগ অনুরাগ। ভালোবাসার নিজস্ব মানুষ। প্রথম প্রেমের থরোথরো হৃদয়ে কাঁপন জাগানো সেই সৌম্য দর্শন যুবক। কোথায় সে এখন? সামনের কোনো ফ্রন্টে যুদ্ধরত। আসবে কি ফিরে কখনও? বাসবো না বাসবো না করে সত্যিকারভাবেই ভালোবেসে ফেলে এখন কষ্টের কী দারুণ তীব্রতা! সে আসে না। মনের গভীরে কষ্টগুলো কেমন ঝাঁক বেঁকে বসে থাকে। চোখ জোড়া জলে ভাসে।

এখানে তার কিছুই ভালো লাগে না। শরণার্থী শিবিরের পাশে দয়া করে জায়গা দিয়েছেন এক হৃদয়বান মানুষ। এটুকুই। আর সব কিছু করে নিতে হয় তাদের। অভাবের করাল গ্রাস। সামনে গভীর অমানিশা। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা রোগ বালাই। হাতের পয়সা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। মহা বিরক্তি আর রাগের সদা বহিঃপ্রকাশ নিয়ে গার্জিয়ান। সবার জন্য খাদ্য জোগাড়, রেশন টানতে যেয়ে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তিনি হাল ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছে যান। ক্ষুধা জরা সকলকে গ্রাস করে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সব সময় দুর্ব্যবহার আর রাগারাগি করেন গার্জিয়ান। অসহনীয়।

পালাতে পারলে হতো। কোথায় পালাবে সে? তার প্রেমিক যুবকটির কাছে যাওয়া কি সম্ভব? ফ্রন্টে, যুদ্ধের মাঠে তার জন্য গভীর আকুতি, অচেনা প্রতিকূল পরিবেশে সব কিছুই অসহনীয়। কোথায় সেই হারিয়ে যাওয়া জগত। সেখানে কোনো দিনই কি ফেরা যাবে? আসে না কেন সেই যুদ্ধের মাঠের সৈনিক? দুর্দান্ত প্রেমময় যুবক। এ জন্য মেয়েটির কান্না।

তার কান্না থামানো যাবে না কোনো কিছুর বিনিময়েই। যদি না জয়বাংলা হয়।

৬.

ঢাকাইয়া নূরু কাপড়ের দোকান দিয়ে বসে এপারে এসেই। জিজ্ঞেস করলে বলে, খামু কী?

খামু কী মানে, সকলেই যা খায়।

একা হইলে পারতাম। আমার রাবণের গুষ্ঠি।

নুরু তার পরিবার নিয়ে উঠেছে বেরুবাড়ির পাশে একটা দু'কক্ষের বাসায়। অর্ধেকটা ভাড়া নিয়ে। স্ত্রী অতিম ়য় এ্যাডভান্স স্টেজ। উপায় নেই। ছাত্রলীগের বড় ধরণের নেতা। যুদ্ধে যাবার কথা ার। কিন্তু শরণার্থী জীবনের ঝামেলা সামলাতে জান ওষ্ঠাগত। এখন তার কাছে অন্যকিছু মূখ্য নয়। পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচানোই অন্যতম দায়। গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিত জয়বাংলা। দীপ্তিময় চেহারা। ছোট-খাটো বেঁটে ধরনের শ্যামলা রঙের টগবগে যুবক। স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত। কিন্তু এখন কেমন মিইয়ে গেছে। এখন তার কণ্ঠে শ্লোগান নেই। যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে নেই। স্বাধীন বাংলার জন্য সরাসরি কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হবার উপায় নেই। এখন লুঙ্গি গেঞ্জির দোকান। চৌকির ওপর বসে থাকা। দরদাম করে কাপড় বিক্রি করা। আর চেনা পরিচিতদের সাথে জয়বাংলার গল্পে অংশগ্রহণ করা।

৭.

যা কেউ ভাবেনি, তাই হতে হল। চলে আসতে হল নিজ দেশ, জন্মভূমি ছেড়ে। সীমান্তের এপারে। ভারতীয় অংশে। দেশের ভেতরে খাওয়া পরা থাকার ঠাঁই আছে, কিন্তু বাঁচার নিরাপত্তা নেই। এপারে জীবন আছে। কিন্তু থাকার জায়গা নেই। সবখানেই ঠাঁই নেই ভাব। মানুষের মধ্য থেকে কোমল অনুভূতি সব উঠে গেছে। যান্ত্রিক মানুষ এখন কেউ কোথাও ঠাঁই দেয় না।

নাম কী?

মাহবুবার রহমান প্রধান দুলু।

যুবক মানুষ। যুদ্ধে যাচ্ছেন না কেন?

যেতে চাই সাহস পাই না।

কেন?

আমাকে নকশাল ভাবে।

তাই কী আপনি?

না, দেশে করতাম ভাসানী ন্যাপ, এপারে এসে নকশাল হয়ে গেছি। অপপ্রচার।

আমাদের সাথে যাবেন?

যাবো।

ডিপেনডেন্টরা আপত্তি করবে না?

করবে। বাট আই ডোন্ট কেয়ার।

হোয়াই?

বিকজ তাদের তিন বেলা খাবার সংস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বর্ডারের ওপরেই আমাদের জায়গা জমি। ফসলের মাঠ। যুদ্ধে আপনাদের সাহায্য করতে চাই। আমাকেও আপনারা করবেন।

হ্যাঁ করবো। আমাদের গাইড হবেন আপনি।

হবো। যে নামেই ডাকেন। শুধু থাকতে দেবেন সঙ্গে। থাকলে উপকার হবে। আমি ফ্রন্টের সব কিছু চিনি। রাস্তা-ঘাট, লোকালয়, হাট-বাজার, শত্রুর অবস্থান ইত্যাদি সব।

ঠিক আছে। চলেন তাহলে।

অদ্ভুত ব্যাপার! দুলু একেবারে নিয়মিত সৈনিকই হয়ে যায়। চমৎকার সুরেলা গানের গলা। রবীন্দ্রসংগীত। তার আর ফিরে চাওয়া হয় না।

৮.

সোনা মিয়া মেম্বার পাক-বাহিনীর দালাল। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তার বাড়িতে খান সেনারা এসে থেকে খেয়ে যায়। ফুর্তি করে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে। অসহনীয়। তিনি এসে সারেন্ডার করেন। জয়বাংলার যুদ্ধে নিজের জান কোরবান দেয়ার শপথ। একারণে একদিন তিনি হারিয়েই যান।

জোনাব আলীর চেহারাটার মধ্যে চোর চোর ভাব। কিন্তু অসম্ভব সাহসী মানুষ সে। ছিল ইপিআর ক্যাম্পের কাজের লোক। এখন সে মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড। অন্ধকার রাতে শার্দূলসম গতি আর ক্ষিপ্রতা নিয়ে, সঠিক লক্ষে সে এগিয়ে নেয় আমাদের।

হাজী কালা গাজী রাতভর জেগে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলোর জন্য। আমরা এলেই যেন তার স্বস্তি। জীবনে কোনোদিন বন্দুকের গুলি ছোঁড়েননি। কিন্তু দৈনন্দিন যুদ্ধের শব্দ শোনার সাথে নিজেকে কেমন মানিয়ে নিয়েছেন। রাত জেগে থেকে তিনি কামান যুদ্ধ দেখেন মেশিনগানের খই ফোটার শব্দ শুনে যান। মুক্তিরা না আসা পর্যন্ত শান্তি পান না। শান্তিপ্রিয় নির্ভেজাল মানুষটি এখন দৈনিক যুদ্ধ খোঁজেন।

মন্টু চেয়ারম্যান মানিকগঞ্জের শরণার্থী। আক্কাসের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় শত্রুর গুলিতে, লাশ হয়ে পড়ে থাকে সে বেরুবাড়ী শরণার্থী শিবিরের পাশে। দলে দলে মানুষ দেখতে যায় মুক্তিযোদ্ধার লাশ। হৃদয় বিদারক দৃশ্য। রউফ, দোহা, লুৎফর, জব্বার, দুদু, মোস্তফা, আনোয়ার প্রফেসরসহ অগণিত মানুষ। দেশে ফেলে এসেছেন তাদের প্রাচুর্য, স্বচ্ছলতা আর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক সামাজিক জীবন।

৯.

সোনাউল্লাহ্ হাউজে কমরেডদের আড্ডা। তেঁতুলিয়া, ঘুঘুডাংগায় ট্রানজিট ক্যাম্প। লেফট রাইট আর দু'বেলা খাওয়া।

অফিসার হবো আমরা, এজন্য যুদ্ধে যাচ্ছি না। অদ্ভুত মানসিকতা!

মানুষের বয়স বেড়ে যায়। অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চায় না। একটা কিছু হোক। হতেই হবে। দেরি আর কিছুতেই নয়।

কমান্ডার জব্বার তার গ্রামের বাড়ি ডোমার থেকে বউ বাচ্চা নিয়ে আসে। ওঠে ভোলা বাবুর গোয়াল ঘরে। তাদের আনন্দের শেষ নেই।

এমপি কমরুদ্দীন মোক্তারের আড্ডা বেরুবাড়ীতে। লোক লস্কর ঘিরে থাকে। তিনি আশা ছাড়েন না। অনেকেই তা ছাড়তে পারেন না। আশা নিয়ে তো বেঁচে থাকা। নইলে মানুষের বাঁচার অবলম্বন কী?

১০.

ওরা ক'জন শরণার্থী হয়ে এসে উঠেছে আত্মীয়ের বাড়িতে। এপার বাংলা ওপার বাংলা। '৪৭-এর পার্টিশনের পর একটি অংশ চলে যায় বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে। অন্য অংশ থেকে যায়। ভারতীয় নাগরিক তারা। শিক্ষা সাংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা, রুচি, খাদ্যাভ্যাস সবগুলোতেই রয়েছে ভিন্নতা। প্রাচীন জোতদারের বাড়ি। সেখানে এসে ওঠে অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা নিকটাত্মীয় শরণার্থী। একসময় যারা ওপারে পাড়ি জমিয়েছিল।

প্রথম ক'দিন আত্মীয়তার উষ্ণ বাঁধনের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। হবেই। গভীর দুঃখ আর হতাশা নিয়ে তারা অপেক্ষা করেন। কিছু একটা চূড়ান্ত কিছু ঘটবার। কাছেই ফ্রন্ট। ঘন ঘন কামানের গোলা ওড়ে। ধরণী কাঁপানো বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। মধ্যরাতে লাগাতার যুদ্ধের বার্স্ট ফায়ার। ভয় পায়না কেউই। শুধুই মনে হয় এ নাহলে তো স্বাধীন হবে না। জয়বাংলা হবে না। প্রতিদিনের যুদ্ধের শব্দ বড় বেশি আপন মনে হয় তাই। পরিবর্তিত মানুষ। দ্রুত কিছু একটা ঘটুক এটাই চায়।

তরুণ যুবা বয়সের ক'জন। বয়সের যা ধর্ম। নিজেদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় করে। ঘোরাঘুরি নির্দোষ আড্ডা। কাজ নেই। অলস মন্থর জীবন। সামনে যুদ্ধ আছে কিন্তু সেখানে যাবার তাগিদ নেই। চলমান যুদ্ধ তাদের উদ্বেলিত করে। কিন্তু যুদ্ধ ডাকে না। এখানে আশ্রয় আছে নিরাপদ। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা আছে। বড়রা হাহুতাশ করে রেডিও শোনে, পত্রিকা পড়ে। যুবক তরুণের দল সামনের বাজরে যেয়ে রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমায়। গরম চা-চারমিনার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে কেউ। নিরুপদ্রব জীবন। শঙ্কাবিহীন।

কিন্তু হঠাৎ করেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। তক্কে তক্কে ছিল। একদিন বিএসএফ এসে তাদের তুলে নিয়ে যায়। এরপর সোজা মেজর শেরকির এফএফ ক্যাম্প। লেফট রাইট, দৌড়াকে চল্। ফ্রগ জাম্প। ফ্রন্টরুল, শাস্তিময় ভয়ানক জীবন। এ থেকে পরিত্রাণ নেই জয়বাংলা না হওয়া পর্যন্ত।

১১.

প্রচণ্ড বিষণ্নতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। চলে যাবো। একরাতের জন্য এসেই চলে যাওয়া। যাবার প্রাক্কালে কাছাকাছি থাকে না সে। বাবা মা ডাকেন। অন্যরা খোঁজ করে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। বাড়ির বাইরে এসে দেখা যায়। বড় একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। আনত দৃষ্টি। তার সেই বিষণ্নতা বুকের গভীরে কেমন কাঁটার মতো বিঁধে থাকে।

অথচ রাতে তার ভাষা ছিল ভিন্ন। আগে কথা প্রায় বলতই না। প্রচুর কথা বলেছে। দেশ ছেড়ে একদঙ্গল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে তার চলে আসার বিবরণে চমৎকৃত হতে হয়। নিজের গল্পে, অন্যদের গল্প, যুদ্ধের গল্প, সামনের ফ্রন্টের গল্প, সবশেষে তাদের সঙ্গে বাসরত সেই হৈ-চৈ পার্টি তরুণ যুবকদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার গল্প। ক্যাম্পে উদ্ধার করতে যেয়ে বাবা-চাচা খালু ফুফাদের নাজেহাল হাওয়া। মেজর শেরকি তাদেরও আটকে দিয়ে বলেছেন, তুম লোগ ভি লেফট-রাইট করো। বলে কী! এই মধ্য বয়সে প্রৌঢ় বয়েস। লেফট রাইট, যুদ্ধের ট্রেনিং? ইয়েস, নইলে ভাগো। যুদ্ধে যাবে না। যুবক বয়স কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। চায়ের দোকানে আড্ডা হৈচৈ। অনেকদিন থেকেই আমরা তাদের ফলো করছিলাম। এখন ধরে এনেছি। তাদেরতো ছাড়া হবেই না, মগার তুম্ লোগ লেফট রাইট করো।

তারা কোনোক্রমে ভেগে এসেছেন। এই গল্প করতে যেয়ে মেয়েটির হাসির দমকে ভেঙে পড়া। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তা ছাড়িয়ে পড়ে সকলের মধ্যে। দূরে গুর গুর যুদ্ধের শব্দ ধ্বনি। যেন শুনতে চায় না কেউ। ইচ্ছে করেই পাশ কাটিয়ে যায়।

সযত্নে বিছানা পেতে দেয়। খাবার পানি দেয় টেবিলে। হারিকেনের নরম আলোয় তাকে কেমন অপরূপ দেখায়। মনে হয় তখন, খুব সকালেই তো কাল চলে যেতে হবে। আর কি কখনও আসা হবে। দেখা হবে। যুদ্ধ কি এটা হতে দেবে? কেন এই যুদ্ধ, এত কষ্ট?

আর আসবেন না।

আসবো।

কবে?

জানি না।

যুদ্ধ করতে হবে। করছেন। অহেতুক রিস্ক নেবেন না।

কেন?

বলছি, তাই!

আর যেন কিছু বলতে চাইছিল, বলা হয় না। চোখে জল। কান্নার আবেগ প্রচণ্ড ভাবে তাকে পেয়ে বসে। অনেক কিছুতই হয়তো বলা দরকার। পারি না। শুধু আলতো করে বলি, আসবো, আবার আসবো, যদি বেঁচে থাকি।

সেই মেয়েটি ভোরের নরম আলোতে গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একা। গভীর বিষণ্নতা নিয়ে। হাসে না কাঁদে না, বিদায়ও দেয় না। কে জানে কী হবে। জয়বাংলা না হলে তার বিষণ্নতা কাটবে না আর কোনোদিন।

১২.

২৮ নভেম্বর শিং পাড়ায় যুদ্ধ হয় রাতভর। পঞ্চগড় দখলের আগে চূড়ান্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ। শীতের কুয়াশা ভেজা রাত। খোলা আকাশের নিচে স্যাঁতস্যাঁতে ধান ক্ষেত। আখ ক্ষেত ফসলের মাঠ, ডাংগা জমি মাড়িয়ে ঘোরতর যুদ্ধের তাণ্ডবতায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলা। মধ্য রাতে ট্যাংক এসে যোগ দেয়। আর্টিলারি, মর্টারের গোলা ছোটে অবিরাম। আমরা এগিয়ে চলি স্থির লক্ষ নিয়ে। শীতার্ত রাত কাবু করতে পারে না। শত্রুর গুলির বন্যা থামাতে পারে না। কোনো বাঁধাই আর বড় হয়ে দেখা দেয় না। ভোর ভোর সময় পঞ্চগড় শহরের উপকণ্ঠ। সিও অফিস দখল। অতঃপর পঞ্চগড় শহরের মূল অংশে পৌঁছানো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক হয়ে যাওয়া একটা শহর। কেমন ভুতুড়ে পরিত্যাক্ত। বিজয়োল্লাস। সকলকে পাগলপারা করে তোলে। উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় গর্জে উঠে জয়বাংলা ধ্বনি। আর তখন তার একটা চিঠি আসে।

যুদ্ধের মাঠের বাঁচা মরার ঠিক নেই। জীবন এখানে বড়ই অনিশ্চিত। কিন্তু সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া বিধ্বস্ত একটা শহর দখলের যুদ্ধের এই পর্যায়ে সব থেকে বড় সাফল্যের লগ্নে একটি চিঠি প্রাপ্তি। কী আনন্দের কী আনন্দের! তখুনি সেটা খুলি না, পড়ি না। পকেটে ঢুকিয়ে সেটা বুকের সাথে সেঁটে রাখি।

জানি, সেখানে কী লেখা আছে। লেখা আছে চিরন্তন নারীর সেই আঁকুতি, বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো।

**মাহবুব আলম**

জন্ম ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫০, রংপুর। শিক্ষা রংপুর জেলা স্কুল থেকে এসএসসি (১৯৬৬) এবং কাবমাইকেল কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৬৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে এম এ। পোল্যান্ডের ওয়ারসো ইউনিভার্সিটি থেকে জন প্রশাসনে এমএস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ৬ নম্বর সেক্টরের ৬/এ সাব-সেক্টরে স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিনের অধীনে পঞ্চগড় এলাকায় যুদ্ধ।

প্রকাশিত গ্রন্থ— গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে (দুই খণ্ড), স্মৃতিসৌধ, এইদিন সেইদিন, এখন বড় অসময়, হাইড আউটের গল্প, যুদ্ধরেখা ইত্যাদি।

# সাব-সেক্টর— সাহেবগঞ্জ
## বেদনা ও আনন্দের গাথা
### ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) আজিজুল হক, বীর প্রতীক

১.

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লালমনিরহাট ছিল একটি প্রশাসনিক থানা। উত্তরে ভারতের কুচবিহার জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম মহকুমা, দক্ষিণ পশ্চিমে রংপুর জেলা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিতে লালমনিরহাটে মোহাজের নামে বিহার থেকে আগত উর্দু ভাষা-ভাষীরা লালমনিরহাট সদরে তাদের অবস্থান নানাভাবে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে। বাঙালিরা প্রতি মুহূর্তে তাদের আগ্রাসনের শিকার হতো। মাঝে মধ্যে সংঘাত বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাত। বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙালিরা স্বকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠত। কিন্তু, নানা কারণে প্রভাব এবং প্রতাপ বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ, অন্যদিকে বিহারীদের প্রতাপ স্থানীয় জন মনে ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে। ষাটের দশক থেকে ৬ দফা আন্দোলনের ঢেউ বাঙালি চেতনাকে শানিত করতে থাকে। বিশেষত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ভাসানী এবং কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বিস্তার লাভের ফলে গোটা দেশের সাথে লালমনিরহাটের মানুষের সংগ্রামী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এবং সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালি মানসে স্বদেশ ভাবনার যে জোয়ার তোলে লালমনিরহাট থানাবাসী আপামর জনসাধারণের সে জোয়ারের ধাক্কা অভূতপূর্ব এক শক্তির জন্ম দেয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে লালমনিরহাটবাসী নির্বিকারভাবে রাজপথে নেমে আসে এবং প্রতিরোধের আগুন বুকে নিয়ে পাকিস্তানিদের অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠে। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' ৭ই মার্চের এই ঐতিহাসিক আহবানে সত্যিকার অর্থেই লালমনিরহাটবাসী শত্রু মোকাবেলার জন্য ঐদিন থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বাঙালি ইপিআর, পুলিশ মুজাহিদ, ছাত্র-জনতা, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তিস্তা ব্রিজের উত্তর প্রান্ত ঘিরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গড়ে তোলে ডিফেন্স লাইন। নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অভূতপূর্ব শক্তি নিয়ে শুরু হয় প্রাণপণ লড়াই। পাকিস্তান আর্মির একজন মেজরসহ বেশ কিছু সংখ্যক পাকসেনা নিহত হয় এবং বাঙালির গড়ে তোলা ডিফেন্স দূর্ভেদ্য হয়ে উঠে।

কিন্তু সে সময়ের কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালির চক্রান্তে হারাগাছ হয়ে তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে ৪ঠা এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী লালমনিরহাট শহরের ব্রিটিশ নির্মিত বৃহৎ বিমান ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করলে বাধ্য হয়ে তিস্তা নদীর উত্তর পাড় বেষ্টিত ডিফেন্স ছেড়ে দিতে হয়। ৫ই এপ্রিল সকাল থেকে বিহারীদের সহায়তায় শুরু হয় বাঙালি নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞ। হাজার হাজার মানুষ পালাতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। গৃহহারা, স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদে একদিকে ভারি হয়ে উঠে আকাশ-বাতাস, অন্যদিকে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শত্রু হনন ও মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে সর্বস্তরের হাজারো মানুষ। ৬নং সেক্টর গঠিত হলে এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার গতিতে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে থাকে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর। গেরিলা পদ্ধতিতে এ আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। শত্রুমুক্ত বুড়িমারী (বর্তমান লালমনিরহাট জেলাধীন) ৬নং সেক্টরের কমান্ডার উইং কমান্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার-এর নেতৃত্বে বড়খাতায় এবং কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারীতে সম্মুখ যুদ্ধের ডিফেন্স শক্তভাবে গড়ে তোলা হয় এবং এই দুই ডিফেন্স লাইনের মাঝপথের বিরাট এলাকা দিয়ে চলতে থাকে গেরিলা আক্রমণের অব্যাহত ধারা। ধরলা নদী পেরিয়ে মুক্ত এলাকা ফুলবাড়ী (বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলাধীন) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অবস্থান কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে।

লালমনিরহাট থেকে ৮ কি.মি. দূরে বড়বাড়ীহাট স্বাধীনতাযুদ্ধে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ধরলা নদী পার হয়ে বড়বাড়ীতে অস্থায়ী অবস্থান নিয়ে পাকহানাদার বাহিনীদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাত বিভিন্ন পথে বিভিন্ন কৌশলে। শুরু থেকেই পাকিস্তানীদের টার্গেট হিসেবে বড়বাড়ীহাট অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু, মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব এবং সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের মাত্রা দেখে পাকহানাদার বাহিনী আক্রমণ করেনি। ইতোমধ্যে দীর্ঘ আট মাস অতিবাহিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এবং মুক্তিযোদ্ধা কৌশল লক্ষ করে পাকসেনারা বড় ধরণের প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং ৯ই নভেম্বর ভোরে তিন দিক থেকে বড়বাড়ীহাটকে আক্রমণ করে। বড়বাড়ীহাট থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত বিমান ঘাঁটি থেকে ২ শতাধিক পাক সেনা সুসজ্জিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। ৩´´ মর্টারের পর পর দুইটি শেল নিক্ষেপ করে তারা আক্রমণ সূচনা করে। বড়বাড়ীহাটে এসে তিন ভাগে বিভক্ত হয় পাকসেনারা। প্রথম দল বড়বাড়ী থেকে ঢুকে গড়ে শিবরামের দিকে, এক দল যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে কুড়িগ্রামের পথে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এগুতে থাকে এবং অন্য দলটি বড়বাড়ীহাটের চারপাশে শুরু করে মহাতাণ্ডব। আত্মরক্ষার্থে পলায়নকারী মানুষকে গুলি করতে থাকে পৈশাচিক উল্লাসে। প্রথম দলটি প্রায় ৪০ জন নিরপরাধ বাঙালিকে ধরে নিয়ে চলে যায় কুড়িগ্রামে। বন্দিদের মধ্যে জনাব নূরুল হক পাটোয়ারী, সে সময়ের ছাত্র বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত জনাব আবদুস ছালাম প্রমুখ ব্যক্তি বীভৎস স্মৃতি নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন পচু পাল, নওশের আলী, গুলিবিদ্ধ রয়েজ উদ্দিন। স্বল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক লোককে হত্যা করা হয়। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ

করা হয় একই সাথে। মুহূর্তে নারকীয় ঘটনা সকল সভ্যতাকে ভ্রকুটি করে বর্বরতার সীমাহীন নজির স্থাপন করে পাক হায়েনারা।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে ধরলা নদী অতিক্রম করে। এই অপারেশনে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংসদের জি.এস ও প্রতিভাবান সংগ্রামী ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা মোক্তার এলাহী পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। শিবরামের এক বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে এই দেশপ্রেমিক সন্তান শত্রুর গুলিতে ঢলে পড়েন বাংলা মায়ের কোলে। মোক্তার এলাহী, পাঙ্গা হাইস্কুলের তৎকালিন প্রধান শিক্ষক ও বড়বাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম, জাহের সর্দারসহ ৩১ জনকে হত্যা করা হয় আইরখামার ডাকবাংলো স্কুল প্রাঙ্গনে ও জগবন্ধু নামক স্থানে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ৯ই নভেম্বর বড়বাড়ীর হাটে ঘটে গেল হৃদয় বিদারক ঘটনা।

এর মাস খানেক পর ১৬ই ডিসেম্বর এল বাঙালির মহান বিজয় দিবস। আজ স্বাধীনতার দীর্ঘকাল অতিবাহিত। এতদিনেও লেখা হল না ত্যাগের এ ইতিহাস, গড়ে উঠেনি কোনো স্মৃতির মিনার। অনাগত ভবিষ্যতের নাগরিকদের কাছে কী জবাব আছে এর? ঐতিহাসিক কারণে, গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাহাত্ম নির্ণয়ে শহীদ এই সন্তানদের উদ্দেশ্যে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে একটি আবেদন— বড়বাড়ীরহাটের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সন্তানদের স্বরণে ইতিহাস রচনা এবং স্মৃতি রক্ষায় এগিয়ে আসুন। ৯ই নেভম্বরে এই বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনায় একত্র হোন। গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক হবার শিক্ষা সম্প্রসারিত করুন।

২.

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৬নং সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস উদ্দিনের অধীনে যুদ্ধে যোগদান করি। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ১১ই সেপ্টেম্বর আমার পিতা মরহুম ছখি উদ্দিন আহমেদ বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যবরণ করেন। আমি আমার পিতার প্রথম পুত্র হয়েও তার নামাজে জানাজায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। সেসময় আমি ভূরুঙ্গামারী-বাঘভাণ্ডার ডিফেন্সে ছিলাম। ১১ই সেপ্টেম্বর দুপুরে আমি ডিউটি চেক করে ২টার সময় ক্যাম্পে ফিরে সংবাদ পাই। কমান্ডার সাহেব আমাকে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারে (সাহেবগঞ্জ) ডেকেছেন। দুপুরের খাবার শেষে সুবেদার বোরহান আমাকে বার বার হেডকোয়ার্টারে যাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমি হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিয়ে বিকেল ৫.৩০ ঘটিকায় হেডকোয়ার্টারে পৌছি। গেটে প্রবেশকালে সেন্ট্রি জানাল—'স্যার, আপনার আব্বা মারা গেছেন, আপনার ভাই একরামুল টেলিফোন করেছিল।' কমান্ডারের নির্দেশে আমি ভারতীয় ট্রাকে চড়ে কুচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। রাত ১০টায় আলিপুর দুয়ারে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। আমার আত্মীয় স্বজন রাতে আমাকে যেতে না দেয়ায় সকালে আমার পরিবারের আশ্রয়স্থল ঢালকর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সকাল ১০টায় পৌছাই। সেখানে পৌছে শুনি রাত ১১টায় আমার পিতার জানাজা হয়ে গেছে। আমার পরিবারের সঙ্গে ২/৩ দিন অবস্থান করে কুলখানি শেষে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসি।

আমার পিতার মৃত্যুর দুই মাস পর নভেম্বরের ১২ তারিখ সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস আমাকে ডিফেন্স লাইন থেকে রাত ১১টায় ডেকে পাঠিয়ে আমার কুশলাদি জানলেন এবং একটি বিশেষ অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন।

কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী রোডের বর্তমান নাগেশ্বরী উপজেলার সন্তোষপুর নামক স্থানে সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপারেশন ম্যাপ দেখানো হল। সন্তোষপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটি সেকশন অবস্থান করছিল। এক সেকশন কমান্ডারের নাম নুরুল হক সরকার এবং অপর সেকশনের দায়িত্বে ছিলেন মঞ্জুরুল ইসলাম। প্রয়োজনীয় আর্মস-এমুনেশন নিয়ে সেকশন দুইটির সঙ্গে যোগাযোগ করে নাগেশ্বরী-ভূরুঙ্গামারী সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হল যাতে করে পাক সেনা নাগেশ্বরী হতে ভূরুঙ্গামারী ও ভূরুঙ্গামারী হতে নাগেশ্বরী যেতে না পারে। নভেম্বরের ১৩ তারিখ বিকাল ৩টায় আমাকে তৎকালীন মেজর ডা. এম.এম. হোসেনের শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা বাবু মোটর সাইকেলযোগে সন্তোষপুরে পৌঁছে দেয়। সেদিন অপারেশন স্থল রেকি করার পর সন্ধ্যায় একটি ছোটখাটো অপারেশন করা হয়। এই অপারেশন করতে গিয়ে ২´´ মর্টার চালক আহত হয়। সেখানে মর্টার চালানোর মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেউ না থাকায় আমি আহত মর্টার চালকের নিকট থেকে মর্টার পরিচালনা করার কারিগরি কৌশল শিখে নেই। আহত মর্টার চালককে হাসপাতালে পাঠানোর পর আমি মর্টার পরিচালনার দায়িত্ব নেই এবং সেটি আমার সঙ্গেই রাখি।

১৪ তারিখ দিনের বেলা যেখানে সড়ক বিচ্ছিন্ন করা হবে জায়গাটি রেকি করার পর রাত আনুমানিক ৯টা হতে অপারেশনের কাজ শুরু করি। প্রথমে একটি বড় আমগাছে মাইন দিয়ে চার্জ করে গাছটিকে রাস্তার উপর ফেলা হয় এবং রাত ১২ টার দিকে হাই এক্সপ্লোসিভ মাইন দিয়ে ৫ থেকে ৭ ফুট রাস্তা কেটে ফেলা হয়।

পরের দিন ১৫ তারিখ সকাল থেকে আমরা অবজারভেশনে ছিলাম। বিকাল ৩ টার দিকে ভূরুঙ্গামারীর উদ্দেশ্যে পাক আর্মির একটি ট্রাক অপারেশনস্থলে রাস্তায় Obstacle দেখে থেমে যায় এবং রাস্তাটি মেরামত করে চালু করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। আমরা তখন ২´´ মর্টার, LMG, SLR, Rifle দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাই। একটানা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। সন্ধ্যায় তারা নাগেশ্বরীর দিকে ফিরে যায় এবং আমরা আমাদের ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসি। রাত আনুমানিক ৮ টায় স্থানীয় এক ব্যক্তি ক্যাম্পে এসে জানায়, আপনাদের ফায়ারিং-এ একজন পাক আর্মি মারা গেছে, আমাদের বাড়ির পার্শ্বে রক্তাক্ত অবস্থায় তার লাশ পড়ে আছে। তিনি আমাদেরকে ঘটনাস্থলে যাবার অনুরোধ করেন। আমরা তাকে পাক বাহিনীর চর হিসেবে সন্দেহ করে তার সঙ্গে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা তাকে বলে দেই, আপনি যান আমরা পরে আসছি।

১৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ৭-৩০টায় আমি গোলাবারুদ লোড না করে ২´´ মর্টার নিয়ে একজন সৈনিকসহ ঘটনাস্থলের দিকে যাই এবং একজনকে LMG, একজনকে SLR, দুইজনকে Rffle ও একজনকে ২´´ মর্টারের গোলা নিয়ে আমাদের পিছনে আসতে বলি। ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা কাটা রাস্তায় উঠি। গোলাবারুদ ও অস্ত্র বহনকারী পাঁচজন আমাদের বেশ কিছু দূর পিছনে ছিল। আমরা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায়

অপারেশনকৃত রাস্তাটি অনেক গভীর করে গর্ত করার প্রস্তুতি নেই। এমন সময় আমার এক সহযোদ্ধা দেখতে পায় যে দুইজন পাক সেনা রায়গঞ্জ হতে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে মেইন সড়ক অভিমুখে আসছে। সে আমাকে ডেকে দেখায় 'স্যার, দুইজন খান সেনা আমাদের দিকে আসতেছে'। আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই দুইজন খাকি পোশাকধারী পাক সেনা পাকা ধানের রংয়ের সঙ্গে মিলে আমাদের দিকে আসছে। আমার সহযোদ্ধা পাক সেনা দুইজনকে দেখে বিচলিত হয়। কারণ আমাদের কাছে তখন শুধু গোলাবারুদ বিহীন অস্ত্র ছিল। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম— তুমি ঘাবড়াবে না, চুপচাপ দেখ আমি কী করছি। এই বলে আমি আমার ২´´ মর্টারটি হ্যান্ড গার্ড পজিশনে নিলাম এবং উচ্চ স্বরে বলতে লাগলাম 'কোন হায় আগে বার্নেকা কোশিশ মত করো' অর্থাৎ কে আছে আগে আসার চেষ্টা করো না। 'এক কদম হিলেগা তো গুলি কর দেগা' অর্থাৎ এক পা আগালে গুলি করে দিব। এই কথাগুলি দুই তিন বার রিপিট করি। আমি উর্দু ভাষা ভালোভাবে ও কিছু কিছু পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারতাম। আমার কথা খান সেনারা হয়তো বুঝতে পারে। তারা এক পা দু'পা করে আমাদের দিকে আসতে থাকে। আমি আবারও উচ্চ স্বরে বললাম, 'হিলো মত আগার হিলেগা তো গুলি করে দেগা' অর্থাৎ নড়বে না, নড়লেই গুলি করব। কিন্তু, এদিকে আমার কাছে ২´´ মর্টারের ব্যারেল ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার মনের সাহস ছিল প্রবল। আমি নিজে বিচলিত হই নাই। পাক পিড়িয়ডে আমার এক ওস্তাদ আমাদের ট্রেনিং দেয় 'দোশমন কো কভি পিঠ মত দেখাও, মরনা হায়তো ছিনাছে মরো, অর্থাৎ শত্রুকে দেখে কখনো পালাবার চেষ্টা করবে না, মরলে বীরের মতো মর। আমার সে মুহূর্তে ওস্তাদের কথাটি মনে পড়ল। আমি এও ভাবলাম আমার পিতা ভারতে মারা গেল, যদি আমি মারা যাই আমার লাশ হয়তো বাংলাদেশে ফিরবে না। আমি তখন মনস্থির করলাম যদি মরি বীরের মতো মরব, পালাবার চেষ্টা করব না। কারণ আমি পালালে আমার সহযোদ্ধারা সহ আমাদের পিছনে মাটি খননের কাজে নিয়োজিত নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ নিশ্চিত মারা যাবে। আমার শেষোক্ত নির্দেশের পর দেখলাম একজন খান সেনা অস্ত্র নিচে রাখল, অপরজন অস্ত্র রাখছে না। আমি আবারও বললাম, 'দোনো গ্রাউন্ড আর্ম কর, মেরা পাছ আজাও' অর্থাৎ দুই জনেই মাটিতে অস্ত্র রেখে আমার কাছে আস। দু'জনেই অস্ত্র নিচে রাখল। আমি পুনরায় বললাম—'হাত উপর করকে অ্যাডভান্স কর' অর্থাৎ হাত উপর করে অগ্রসর হও। দু'জনে হাত উপর করে আমার কাছে আসল। একজন আমার হাত ধরে বলল, 'আপ লোক কোন হায়' অর্থাৎ আপনারা কারা। আমি উত্তরে কৌশলে বললাম 'হাম রাজাকার হায়' অর্থাৎ আমরা রাজাকার। সে আবার বলল, 'আপ লোক ইধার কিয়া কর রহে' অর্থাৎ আপনারা এখানে কী করছেন। উত্তরে বললাম, 'দেখো সালা মুক্তি লোকনে রাস্তা খারাপ কর দিয়া, নাগেশ্বরী মে লেফটেন্যান্ট ছাহেব নে হাম লোককো রাস্তা ঠিক করনেকা অর্ডার দিয়া, ইছি রাস্তাছে কানভাই আনে ওয়ালা হায়, ভূরুঙ্গামারী মে এ্যাটাক করনা হায়' অর্থাৎ শালা মুক্তিরা রাস্তা খারাপ করে দিয়েছে, নাগেশ্বরী হতে লেফটানেন্ট সাহেব আমাদেরকে রাস্তা ঠিক করতে অর্ডার দিয়েছে। এ রাস্তা দিয়ে ভূরুঙ্গামারী আক্রমণ করার জন্য কনভয় আসবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীতে নতুন অফিসার লেফটেন্যান্ট হতে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত

সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাত। এই ধারণা করে আমি লেফটেন্যান্ট এর কথা বলি। তাদের একজন আমাকে একজন লেফটেন্যান্ট-এর নাম বলে বলল 'ওহি; লেফটানেট ছাব হায় না-নাগেশ্বরী মে? খান সেনারা যার নাম বলল। আমি তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললাম 'হাঁ ওহি লেফটানেন্ট ছাহাব নাগেশ্বরী মে হায়'। খান সেনারা আমাদের বলল 'হাম লোককো লেফটানেন্ট ছাহাব কা পাছ পৌছাইয়ে' অর্থাৎ আমাদের কে ঐ লেফটানেন্ট নিকট নিয়ে যান। তারা কতজন আছে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপ লোক কেতনা আদমী হায়'। উত্তরে তারা বলল 'হাম লোক দো আদমী হায়, রাতকো জো ফায়ার হোয়া সব আদমী ভাগ গিয়া হাম লোক নয়া আদমী, রাস্তা নেহি জানতে ভাগনে নেহী ছেকা' অর্থাৎ রাত্রে যে গোলাগুলি হয়, তখন সবাই পালায়, আমরা নতুন, রাস্তা জানা ছিল না বলে পালাতে পারিনি। তখন আমি তাদের কোমরে হাত দিয়ে দেখলাম তাদের নিকট কোনো গ্রেনেড আছে কি না। কারণ যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সৈনিককে আত্মরক্ষার জন্য দুটি করে গ্রেনেড ইস্যু করা হয়। গ্রেনেড না থাকায় তাদের কোমরে বাধা চাইনিজ এমুনেশনের বান্ডুলিয়ার খুলে দিলাম। দেখলাম তাতে চাইনিজ রাউন্ড ভর্তি করা ছিল। আমার সঙ্গী এক মুক্তিযোদ্ধাকে ইশারা করলাম— পিছনে ফেলে আসা খান সেনাদের অস্ত্র দুটি নিয়ে আসতে। সে অস্ত্র নিয়ে এসে বলল— অস্ত্র এনেছি স্যার। যে মুক্তিযোদ্ধাটি অস্ত্র আনল তার কাছে ছিল SLR। খান সেনা দুটি SLR দেখে বলল 'ইয়ে হাতিয়ার তো মুক্তি কা হায়' অর্থাৎ এই অস্ত্র তো মুক্তিযোদ্ধাদের। খান সেনাদের ভয় পাওয়ার কারণ হল, যুদ্ধের সময় SLR থাকত শুধু ভারতীয় সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট, পাক সেনাদের কোনো SLR ছিল না। আমি খান সেনাদের আশ্বস্থ করে পাঞ্জাবী ভাষায় বললাম, 'আলাকা তোম লোক ঘাবড়া গিয়া? ইছে হাতিয়ার হামলোক মুক্তিছে কজা কিয়া' খান সেনা দু'জন আমার কথায় আশ্বস্ত হল। তারা মনে করল আমরা তাদের লোক। তাই তারা আমাদের বলল, 'হাম লোক দোদিন ছে কোছ খায়া নেহি, আপলোক কা কেম্প মে লে জাইয়ে কুছ খানেকা দিজিয়ে' অর্থাৎ আমরা দুই দিন থেকে কিছু খাইনি, আপনাদের ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের জন্য কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাটি পাকিস্তান আর্মিতে ছিল, সে ছুটিতে আসার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেও উর্দু বলতে পারত। সে বলল— 'খোদাকি কছম হাম লোক আপলোককো হামারা কেম্প মে লে জাইংগে ঘাবড়াও নেহি'। ইতোমধ্যেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেছে। একজনকে রশি আনার জন্য বললাম। রাস্তার পাশেই একটি ছাগল বাঁধা ছিল। ছাগলটি ছেড়ে দিয়ে রশি আনল। রশি দিয়ে যেই খান সেনাদের হাত বাঁধতে যাচ্ছি, তারা বলল, "আপ লোক কেয়া কর রাহে" অর্থাৎ আপনারা কী করছেন। তখন খান সেনাদের বললাম, 'সালে লোক জানতে হো হাম লোক কৌন হায়? হাম লোক রাজাকার নেহি হায়, হাম লোক মুক্তি হায়। জয় বাংলা বোলো' অর্থাৎ আমরা রাজাকার নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তাদেরকে জয় বাংলা বলতে বলায় তারা বলল, 'জয় বাংলা কেয়া হায়' অর্থাৎ জয় বাংলা কী? অমনি দু'জনের গালে সজোরে চড় মারলাম। এরপর আর কাউকে মারতে দেই নাই। জানি, এরা দু'জনতো একরকম মরেই গেছে, তাদেরকে আর মেরে কী হবে। এই ভেবে তাদের চোখ হাত বেঁধে নিয়ে আসছি। তখন সকাল সাড়ে নটা বা দশটা হতে পারে।

খান সেনা ধরার খবর পেয়ে চৌধুরীরহাট হাই স্কুলের ছাত্ররা প্রত্যেকের হাতে লাঠি নিয়ে খান সেনাদের মারার জন্য দল বেঁধে আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা রাস্তা বেরিকেড দিলাম যাতে ছাত্ররা কিছু করতে না পারে। খান সেনাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য চৌধুরীর হাট BSF ক্যাম্পে তাদের রেখে আমি সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আসি। সেক্টর কমান্ডার বাশার সাহেব ও সাব-সেক্টর কমান্ডার নওয়াজেস সাহেবকে বিস্তারিত ঘটনা জানাই এবং খান সেনা দু'জনকে আনার জন্য একটি গাড়ি চাই। তারা দুজনেই আমাকে এই কাজের জন্য প্রশংসা করলেন। পাশাপাশি আমাকে সাবধান করে দিলেন এরকম সাহস যেন আর না দেখাই। পরে আমাকে একটি জিপ গাড়ি দিল। আমি খান সেনা দু'জনকে BSF ক্যাম্প থেকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দেই। এরপর তাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে প্রিজনার অফ ওয়ার হিসাবে জেলে পাঠায়। আমি সেদিন দেখেছি মৃত্যুর আগে মানুষের অবস্থা কেমন হয়। আটককৃত খান সেনারা জানত তাদের নিশ্চিত মৃত্যু। তাদের দু'চোখে অঝোরে পানি পড়ছে আর যত রকম কলেমা আছে তারা পাঠ করছে।

জীবিত দুই খান সেনা ধরা পড়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান আসে। ফটো তোলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ভারতের কয়েকটি পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ ছাপান হয়। পরে যুদ্ধের মোড় এগুতে থাকে, এ সমস্ত সংবাদ রাখার আর চেষ্টা করি নাই।

এই ঘটনার চার দিন পর অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর ছিল আমাদের ঈদ-উল-ফিতরের দিন। ঐদিন আর এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। ঈদের দিন সকালে সেকেন্ড লে. সামাদ শহীদ হন।

যে দুইজন খান সেনাকে সশস্ত্র অবস্থায় আটক করা হয়েছিল তাদের একজনের নাম সিপাহী আতা মোহাম্মদ, ৪৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি এবং অপরজন সিপাহী আসলাম খান নেওয়াজী, ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। দুই জনের নিকট হতে দুইটি ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেল ও ২০০+২০০= ৪০০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত চাইনিজ রাইফেল দুইটির মধ্যে একটির নম্বর ছিল 05492। ১৫ তারিখে পাক সেনাদের সঙ্গে গোলাগুলির সময় তাদের ফেলে আসা MMG-এর গুলি ১১১০ রাউন্ড, ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেলের গুলি ১৯৪০ রাউন্ড ঐ স্থান হতে উদ্ধার করা হয়।

**ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) মোঃ আজিজুল হক, বীর প্রতীক**

জন্ম ১লা এপ্রিল ১৯৪৫, লালমনিরহাট। শিক্ষা : লালমনিরহাট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এইচএসসি পাস। ১৯৬৫ সালে মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি। ১৯৬৮ সালে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত। একাত্তরে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন বীরত্বের সাথে। মুক্তিযুদ্ধে তার সাহসিকতা ও অবদানের জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রংপুর সেনানিবাসে ১৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থেকে কোয়াটার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।

# উত্তর জনপদের এক রণাঙ্গন

## মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের সব চাইতে স্মৃতিময় অধ্যায়। লাখো শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি জাতি সুদীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। শত সংগ্রাম ও সর্বোচ্চ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির বীরত্ব অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে গৌরবময় বিজয় অর্জন বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের নিকট দৃষ্টান্ত ও প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। আমরা সত্যই সৌভাগ্যবান সেদিন আমাদের অনেকের জীবনে সুযোগ এসেছিল মাতৃভূমির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার। সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের আমিও একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই ভূখণ্ডের বাঙালিরা স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার প্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান আমল জুড়ে কখনো সামরিক শাসন কখনো বেসামরিক সরকারের লেবাসে সামরিক সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন, দুঃশাসনে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং আন্দোলন থেকে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়।

যুদ্ধের ঘটনাবলি সুখপাঠ্য কিংবা শুনতে বা জানতে বেশ উত্তেজনাকর এটা সত্যি। কিন্তু যুদ্ধ মানেই ভয়াবহতা যুদ্ধ মানেই শত্রুর উপর আঘাত যুদ্ধ মানেই শত্রুকে ঘায়েল কিংবা নিধন করা, যুদ্ধ মানেই ধ্বংসস্তুপের উপর নব জাগরণ, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ মূলত একটি সফল জনযুদ্ধ। প্রচলিত যুদ্ধের রণনীতি কিংবা রণকৌশলের দিক থেকেও স্বতন্ত্র। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিপরীতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ? যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আসা বাঙালি সন্তান ইপিআর, পুলিশ, আনছার মোজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছাত্র কৃষক এবং শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত! বস্তুত মোটেও তেমনটি না। মূলত সেদিনের যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানের বর্বর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্জলিত নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্য, দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ এবং সম্মিলিত শক্তির মূর্ত প্রতীক ও সম্মিলিত কণ্ঠের বহিঃপ্রকাশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর সেই দেশমাতার গর্ভে জন্মেছিল সূর্য সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনী।

আমরা যোদ্ধা কিংবা যুদ্ধাকাঙ্খা হিংস্র বর্বর নিষ্ঠুর ও পরজাতির ধন লোভী কখনই ছিলাম না। আমরা নিরীহ, আমরা দেশপ্রেমিক আমরা ধার্মিক এবং ভিন্ন জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আচার, আচরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তার স্বাক্ষর বহন করে। রণহুংকার কিংবা রণসঙ্গীত আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নেই। শত শত বৎসর ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা পর আক্রমণকারী দখলদারদের শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ব্রিটিশদের এ দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামে আমাদের দেশের অনেক সূর্যসন্তান আত্মাহুতি দিয়ে ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন।

মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাই অর্জন করেছেন। দলগত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ, প্লাটুন, কোম্পানি ব্যাটালিয়ান, সেক্টর, সাব-সেক্টর ইত্যাদি আর সকল অভিজ্ঞতার সামষ্টিক রূপ জাতীয় অভিজ্ঞতা। ১১ নম্বর সেক্টর অধীন সেদিনের মহুকুমা বর্তমানে গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন এলাকায় সহযোদ্ধারাসহ মাঠে ময়দানে যুদ্ধ করেছি। কখনো "আঘাত এবং দৌড়" আবার কখনো সম্মুখ যুদ্ধ, কখনো অতর্কিত আক্রমণ, কখনো প্রতিহত। এছাড়াও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে আতংকিত ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে পরাস্ত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। শহরের ছাত্র ও যুবক ছাড়া মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের গরীব কৃষক পরিবার থেকে আসা খেটে খাওয়া মানুষ। শারীরিকভাবে যোগ্য সহজ সরল দরিদ্র জীবনে অভ্যস্ত কষ্টসহিষ্ণু অদম্য মনোবল, অসীম সাহস ও নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই সকল তরুণ যুবকেরা সামান্য প্রশিক্ষণ ও অতীব সাধারণ প্রচলিত অস্ত্র দ্বারাই সু-প্রশিক্ষিত ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে করতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়। শত শত ক্ষতি স্বীকার ও নিশ্চিত মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে গণমানুষের সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট হয়ে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে যায়।

আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার বাড়ি গাইবান্ধা শহরে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে গাইবান্ধায় চলে আসি এবং স্থানীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ইতোমধ্যেই গাইবান্ধা কলেজের ইউওটিসি এর ডামি রাইফেল দিয়ে কলেজ মাঠে রাতের বেলা ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং চলছিল। ২৫শে মার্চের কালরাতে হত্যাযজ্ঞের পর উত্তরের সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে আফতাব হাবিলদারের নেতৃত্বে ত্রিশ জনের একটি বাঙালি সেনাদল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে গাইবান্ধায় এলে তাদেরকে কেন্দ্র করে। ইতোমধ্যেই ডামি রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবকেরা গাইবান্ধা ট্রেজারির আনছার বাহিনীর গচ্ছিত প্রায় তিনশত রাইফেল নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রংপুর সেনানিবাস থেকে কয়েক দফা পাকিস্তান বাহিনী এসে প্রতিরোধ বুহ্য ভেদ করতে আক্রমণ করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৭ই এপ্রিল কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও অধিক শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলে আমরা টিকে থাকতে পারিনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গাইবান্ধা শহরে ঢুকে পড়লে আমরা শহর ছেড়ে পূর্ব দিকের ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়

নেই। রাত কাটিয়ে পরের দিন বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির অদম্য বাসনা নিয়ে ভারতের অজানা গন্তব্যে রওনা হয়ে যাই।

আমরা ২৫ জনের একটি দল বড় আকারের একটি নৌকায় চেপে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে গভীর রাতে কালাসোনার চরে যাই। ১০ই আগস্ট সকালে খবর এল মানস নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন রতনপুর গ্রামে একদল রাজাকার এসে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ করছে। আমাদের অবস্থান নদীর পূর্ব পাড়ের গ্রামে। নদীর পাড়ে এসে ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়ে আমরা ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় ভাগ হয়ে অতি সন্তর্পনে মানস নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে অবস্থান নিলাম। শত্রুরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমাদের পাল্টা আক্রমণে ওরা পরাস্ত হয়ে পালানোর চেস্টা করে। আমরা পলায়নপর বার জন রাজাকারকে অস্ত্রসহ হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দুইজন রাজাকারকে পালানোর সময় স্থানীয় জনগণ ধরে পূর্ব ক্রোধের বসে ধারালো কোদাল দিয়ে ওদের দেহ কুপিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। রাজাকারদের নিকট থেকে দখল করা ষোলটি রাইফেল ও গোলাবারুদসহ রাজাকারদের হাতে পায়ে দাড়ি দিয়ে বেঁধে পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরের কালাসোনার চরে ফিরে এলাম। বন্দি রাজাকারদের দুইজন সাথী যোদ্ধাদের পাহারায় আমাদের মুক্ত এলাকার ক্যাম্পে পাঠিয়ে পরবর্তী নিশ্চিত যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমাদের অনুমান এবং ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। বিকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ছুটে আসল রাজাকার ধরার স্থানে। আমরা কিছুটা তৈরি থাকাতে সহসাই যুদ্ধ বেঁধে গেল। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় হবার পর পাকবাহিনী পিছু হটে পালিয়ে যাবার সময় দুই তিনজন আহত হল। আমরা পুনরায় কালাসোনার চরে ফিরে পরের দিনের নির্ঘাত যুদ্ধের কৌশল, পরিকল্পনা, জনগণের উপর সমূহ নির্যাতনের সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তাসহ রাত্রিযাপন করলাম। ধারণা ও আনুমানিক হিসাব এতটুকু ভুল ছিল না। সকাল থেকেই শুরু হল অগ্নিসংযোগ, বর্বরতা, লুটতরাজ। চারিদিকে নিরীহ মানুষের আর্তচিৎকার ও আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। সে এক নারকীয় দৃশ্য। প্রথমে লুটতরাজ করে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে লুট করা মালামাল দুটি নৌকায় বোঝাই করে মানস নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে নিরীহ মাল্লামাঝিদের দিয়ে নৌকার গুণ টানিয়ে উজানে রসুলপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্পের উদ্যেশে রওনা হল। কয়েকজন করে পাকসেনা নৌকার ছৈয়ের উপর অস্ত্র উঁচিয়ে বসে, বাকিরা নদীর পাড় দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিল। যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে আমরা মোটেও ভালো অবস্থানে ছিলাম না। আমাদের অবস্থান শত্রুকে আক্রমণ করার পর্যায়ে ছিল না। ওদের সমান্তরালভাবে আমরাও চরের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সেই সকাল থেকে শুরু করে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে একটু পানি পর্যন্ত পান করার সুযোগ হয়নি। কাশবন, কলাই ও ধৈনচা গাছের কারণে নদীর পূর্ব তীর বনাঞ্চলের মতো দেখাচ্ছিল। আর সেই আড়াল আবডালের সুযোগে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম। এতক্ষণ সুবিধা ছিল কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমাদের সামনে চরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একটি নালা। সেটি অতিক্রম করতে গেলে পশ্চিম পাড়

থেকে শত্রুরা আমাদের দেখে ফেলবে। এখন আর উপায় নেই, শুধুমাত্র একটি পথ খোলা। তাহলো শত্রুকে আক্রমণ করে পরাস্ত করা এবং নিজেদের বাঁচানো। মুহূর্তেই তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রথম আঘাতেই নৌকার ছৈয়ে বসা সৈন্যরা গুলিবিদ্ধ পাখির মতো পানিতে পড়তে লাগলো। যারা নদীর পাড় দিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছিল এখন তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্রলিং করে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় হবার পর ওদের কয়েকজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে ৩/৪ জন করে ভাগ হয়ে নদী পার হয়ে নৌকা দুটির নিকট যেয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। চার জন যুবতীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছাগল, খাসি, বাক্স, ট্রাংক, চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে নৌকা বোঝাই ছিল। মুহূর্তেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগলো ইতোমধ্যেই পাক সেনাদের কয়েকটি লাশ নদীতে ভেসে গেছে। বাকি ৬/৭টি লাশ গ্রামবাসী তড়িঘড়ি করে নদীতে ভাসিয়ে দিল। বেদনা এবং বিষণ্নতার মাঝেও যেন আনন্দের বন্যা। স্থানীয় মুরুব্বিদের ঐ সকল লুটকরা মালামাল যথাযথদের ফেরত দেবার জন্য বুঝিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি চাইনিজ স্টেনগান ও পাঁচটি চাইনিজ রাইফেলসহ বেশ কিছু গোলাবারুদ ও রাজাকারদের দশটি রাইফেল আমাদের হস্তগত হল। দখলকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং ধরা পড়া কয়েকজন রাজাকারকে নিয়ে যখন ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরের মুক্ত এলাকায় ফিরে এলাম তখন যেন আনন্দের উৎসব। মুক্তিকামী জনতা ঐ ধৃত রাজাকারদের হত্যা করতে চায়। মানকাচর সাব-সেক্টরের আমরাই প্রথম মুক্তিযোদ্ধা দল যারা পাক সেনাবাহিনীর দখলকৃত অস্ত্র ও রাজাকারদের বন্দি করে মুক্ত এলাকায় নিয়ে এসেছিলাম। বাঙালি সন্তান ভুল করে বাঙালির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নেমেছে এই বিশ্বাসে সেদিন ওদের ক্ষমা করেছিলাম। মজার বিষয় হচ্ছে ঐ সকল বন্দি রাজাকারদের সকলেই চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত আমাদের রঞ্জু কোম্পানির সাথেই ছিল। পাক সেনাকে হত্যা করে তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করার প্রথম এই সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে আমাদের অঞ্চলের যুদ্ধের গতি নতুন মাত্রা পেল। আমাদের সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেক অনেক বেড়ে গেল।

এই সফল অভিযানের কয়েকদিন পরেই আমাদের অপর একটি দল বোনারপাড়া-ফুলছড়ি রেলওয়ের ভারতখালী রেল স্টেশনের পশ্চিমে রেল লাইনে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন বসিয়ে পাকিস্তানি সেনা বহনকারী একটি ট্রেনের কয়েকটি বগি উড়িয়ে দিয়ে পাক বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করলে লে. কর্নেল রহমত উল্লাহ এবং মেজর শের আলী খানসহ প্রায় বিশ জন পাক সেনা নিহত হয়। পাকিস্তান বাহিনী সাধারণত ট্রেনের ইঞ্জিনের সম্মুখে একটি কিংবা দু'টি খালি মালবাহী বগি সংযোগ করে চলাচল করত। সে কারণে তাদের হতাহতের সংখ্যা আশানুরূপ হয়নি। এমন ধরণের অভিযান পরিচালনার সময় আশেপাশের জনগণের উপর পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবে, সমূহ ক্ষতি এবং নিশ্চিত মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে নিরীহ জনগণ মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহ প্রদানসহ সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

আগস্টের প্রথম দিকে খুব সুষ্টুভাবে কমান্ড স্থাপিত হল। সেক্টর হেডকোয়ার্টার, সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং কয়েকটি করে যুদ্ধরত কোম্পানি। আমাদের ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন মানকাচর সাব-সেক্টরের কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে খন্দকার রুস্তম আলী, মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, এম এন নবী লালু, আমিনুল ইসলাম সুজা এবং খায়রুল আলম (নজরুল ইসলাম) প্রমুখ এক একটি কোম্পানির সেনাবল একশ পঞ্চাশ জনের অধিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনশত ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোম্পানি কমান্ডারদের নাম অনুসারে কোম্পানিগুলির নামকরণ করা হয়। যেমন রুস্তম কোম্পানি, রঞ্জু কোম্পানি, লালু কোম্পানি, সুজা কোম্পানি, ায়রুল আলম কোম্পানি ইত্যাদি।

গাইবান্ধা শহর থেকে সুন্দর ঞ্জ থানা এলাকায় যাবার রাস্তায় প্রায় তিনশত ফুট দৈর্ঘ দাড়িয়াপুর সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ। সেতুটি উড়িয়ে দিতে পারলে শত্রুর যোগাযোগ ব্যাহত হবে এবং সেই সুযোগে শত্রুর উপর আক্রমণ জোরদার করে শত্রুকে ঘায়েল করা সহজ হবে। পরিকল্পনা মাফিক আমাদের রঞ্জু কোম্পানির প্রায় একশ জন সদস্য ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে সুন্দরগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ শ্রীপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। পথ-ঘাট দেখানোর জন্য স্বেচ্ছায় ষাটোর্ধ বয়সের শরণার্থী রাজেন বাবু আমাদের সাথে এসেছেন, তার বাড়ি সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ছাপড়হাটি গ্রামে। ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনগত রাতে সেতুটির উভয় প্রান্তের পাহাড়ারত শত্রু পক্ষের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই হয়। সেতুটির গুরুত্ব বুঝে পাকা বাংকার বানিয়ে শত্রুপক্ষ বেশ কিছুদিন যাবত সেখানে অবস্থান করছিল। যাহোক শেষ পর্যন্ত শত্রুরা পরাস্ত হলে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক বসানো হল। বিকট শব্দে দাড়িয়াপুর সেতু ধ্বংস হয়ে পানিতে পড়ে যায়। এতবড় একটি সেতু ধ্বংস হয়ে পানিতে পড়ে যাবার দৃশ্য স্বল্প কথায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সফল অভিযানের আনন্দ নিয়ে আমরা ভোরবেলা আশ্রয়ে ফিরছিলাম। দাঁড়িয়াপুর সেতুর দুই কিলোমিটার উত্তরে মাঠের হাটে পৌছলে আমাদের উপর অতর্কিত হামরা হল। মুহূর্তেই আমাদের কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। গুলি বিনিময় করতে করতে আহতদের নিয়ে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে আহত সহযোদ্ধাদের দ্রুত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরের মুক্ত এলাকায় পাঠাই। আমরা বাকি সবাই সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ছাপড়হাটি এলাকায় আশ্রয় নিলাম। এলাকাটি ঘন বাঁশবাগানে ঘেরা। ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। বিকাল পর্যন্ত একটানা গুলিবিনিময় হলে আবারো আমাদের কয়েকজন আহত হয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্তত বিশ-পঁচিশজন সেনা আহত কিংবা নিহত হয়। আমরা আহত সাথীদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে আসি এবং আহতদের দ্রুত সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। যুদ্ধ শেষে ঐ দিন রাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি জ্বরের মাত্রা ১০৬ ডিগ্রি পার হয়েছিল বলে শুনেছি। আহত সহযোদ্ধাসহ অধিকাংশরাই ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিলেও প্রায় দশ জন সহযোদ্ধাসহ আমি এবং রাজেন বাবু নৌকা না পাওয়ায় দক্ষিণ শ্রীপুরের এক দরিদ্র কৃষকের আশ্রয়স্থলে থেকে যাই। পরের রাত্রে বড় নৌকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছোট নৌকায় আমরা রওনা হই। গভীর রাতে মাঝ নদীতে প্রচণ্ড ঝড়-

বৃষ্টি শুরু হয়। আমাদের ছোট্ট নৌকাটি ঝড়ের কোপে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভয়ে আমাদের সহযোদ্ধাদের সকলে উচ্চকণ্ঠে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু... কলেমাসহ বিভিন্ন দোয়া দরুদ পড়তে থাকে। রাজেন বাবু উচ্চস্বরে হরি-গুরু-হরি-গুরুসহ বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করছিলেন তার সাথে দুই হিন্দু সতীর্থ নির্মল ও ষষ্ঠি একই সুরে জপতে লাগল। জ্বরের তাপে এক পর্যায়ে আমি মূর্ছা গিয়েছি। যখন হুঁশ হল তখন নির্ঝর পরিচ্ছন্ন ভোর রাত। সকলের মুখে মহাবিপদের পরের স্বস্তির হাসি। সে রাতে সে অসম্প্রদায়িক পরস্পরের প্রার্থনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার স্মৃতিস্পটে চির জাগরুক।

ইতোমধ্যেই পাকিস্তানিরা ব্রহ্মপুত্র নদের সমান্তরাল পশ্চিম তীর ঘেঁষে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সেটির কামারজানি, রসুলপুর স্লুইসগেট, রতনপুর, ফুলছড়ি, সাঘাটা ইত্যাদি স্থানে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। বাঁধের উপর দূরত্বভেদে মাঝে মাঝে রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প বসিয়ে বাঁধ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য মুক্তিবাহিনী যেন ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে এসে বাঁধ পার হতে না পারে। কালাসোনারচর এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মাঝ দিয়ে মানস নামের ছোট একটি নদী প্রবাহমান। ইতোমধ্যেই আমরা মানস নদী পার হয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংলগ্ন ক্যাম্পগুলি আক্রমণ শুরু করেছি। ৫ই অক্টোবর ও ২৫শে অক্টোবর রাতে ক্ষীপ্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে কাইয়ার হাট ও কেতকীর হাট রাজাকার ক্যাম্প দখল করে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা দখল করি। ওদের কেউ আত্মসমর্পণ করেছে আর কেউবা জীবন নিয়ে পালিয়েছে।

রাজাকারদের এই ক্যাম্পগুলি থেকে আশেপাশের গ্রামের জনগণের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হতো। ২৯শে অক্টোবর ফুলছড়ি থানার কঞ্চিপাড়া গ্রামে রসুলপুর স্লুইচগেটের পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে প্রায় ২০/২৫ জন পাকিস্তানি সেনা তাদের দোসর রাজাকারদের সাথে নিয়ে লুটতরাজ করতে এলে আমরা আক্রমণ করি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে পালাতে থাকে এবং একে অন্যের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমরা খবর পাই পাকিস্তানির একজন সৈনিক অস্ত্রসহ একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আমরা সন্তপর্ণে বাড়িটি দীর্ঘ সময় ঘিরে রাখি। সন্ধ্যা নেমে আসছে বিধায় আমাদের কয়েকজন সহযোদ্ধা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তল্লাসী করতে থাকে। বাড়িটির এক কোণে মুরগি পালনের ছোট্ট একটি ঘরের পাশে লুকিয়ে থাকা ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সৈন্যকে আমরা ধরে ফেলি। আশ্চর্য ও নির্মম সত্য যে, ঐ বাড়ির মা-বোনেরা পাকিস্তানের ঐ সৈনিককে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল। বাঙালি মা-বোনের চিরায়ত মমত্ববোধের ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের কোমল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

আমাদের অবস্থান মোটেও নিরাপদ ছিল না। উত্তর দক্ষিণে কয়েক মাইল কালাসোনারচর বিস্তৃত কিন্তু প্রস্থে খুব সামান্য। পূর্ব দিয়ে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আর পশ্চিম দিকে ছোট মানস নদীটি পার হলেই বাঁধের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শত্রু ক্যাম্প। পিছনে অরক্ষিত, সামনে তোপের মুখে। সামরিক কৌশলগত দিক থেকে মহা বিপদোম্মুখ অবস্থান। তার উপর পাক বাহিনীর দোসর, দালাল, শান্তি কমিটি, আলবদর,

রাজাকারদের উৎপাত। রঞ্জু কোম্পানির তখন পাঁচটি প্লাটুন নিয়ে কালাসোনারচরের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল।

৩রা নভেম্বর ভোরবেলা পাকবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে পড়ে গেলাম। বালাসী ঘাটের কাছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং মানস নদীর মাঝে সমান্তরাল আরেকটি অনুচ্চ বাঁধ ছিল। আমরা ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আর ওরা অবস্থান নিয়েছিল সেই অনুচ্চ বাঁধে। সমর কৌশলের দিক থেকে আমাদের চেয়ে ওদের অবস্থান অনেকটা নিরাপদ। আমরা জমির আইলে অবস্থান নিলাম। তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। গুলি বিনিময় চলতে থাকলো। ভোর থেকে ক্রমে সূর্যের আলো বাড়ছে আর এদিকে রণাঙ্গনের উত্তাপও বেড়ে চলেছে। আমাদের সাথী ফজলু একটু ভালো অবস্থানে যাবার চেষ্টা করতেই পাঁজরে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। অদম্য সাহসী মান্নান ওকে পিঠে নিয়ে ভালো অবস্থানে নেবার চেষ্টা করলে পুনরায় আরেকটি গুলি ফজলুর ঘাড়ে বিদ্ধ হল। ফজলু ছটফট করতে করতে একটু পানি চাচ্ছিল। আমি অতি সন্নিকটে কিন্তু ওর আমৃত্যু পিপাসা আমি মেটাতে পারিনি, ওর মুখে দেবার মতো এতটুকু পানি ছিল না কোথাও। প্রথমে আর্তনাদ পরে ছটফট করতে করতে অশান্ত ফজলু চির শান্ত হয়ে গেল। ফজলু শহীদ হল, আহত হয় তাজুল ইসলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল, ফজলুর মৃতদেহ পড়ে রইল। আমরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ জোরদার করলাম। পাকিস্তানি সেনারা শেষ পর্যন্ত পিছু হাঁটতে বাধ্য হল, পালিয়ে বাঁচল। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে ফজলুর মৃতদেহ ও আহত তাজুলকে নিয়ে কালাসোনার চরে ফিরে এলাম। স্থানীয় জনগণ সমবেদনা জ্ঞাপন করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে দিল। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ কালাসোনারচরের নাম শহীদ ফজলুর নামে রাখার প্রস্তাব করলে কালাসোনারচর ফজলুপুর ইউনিয়ন নামকরণ করা হয়। ফজলু চিরকাল মুক্তিযুদ্ধের গৌরব হয়ে রইল।

**মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক**

জন্ম : ১৭ই জুন ১৯৫২, গাইবান্ধা। শিক্ষা : গাইবান্ধা সরকারি হাইস্কুল থেকে ১৯৬৮ সালে এসএসসি এবং রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৭০ সালে এইচএসসি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিদ্যায় অনার্স এবং মাস্টার্স।

একাত্তরের প্রথম বর্ষ সম্মানের ছাত্র যখন তখনই রঞ্জু যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। ১১ নম্বর সেক্টরের রঞ্জু কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে কোম্পানিসহ যুদ্ধ করেন মাইনকারচর সাব-সেক্টরের অধীনে। যুদ্ধে অসম সাহস প্রদর্শনের জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' বীরত্ব উপাধি প্রদান করে। মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক বর্তমানে ব্যবসায়ী।

# চট্টগ্রাম বন্দরে নৌ-কমান্ডো অপারেশন

মোহাম্মদ ফজলুল হক

১৯৭১ সন, আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ২য় বর্ষ (সম্মান) শেষ সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থী। ২৬শে মার্চের সেই কালো রাত্রির ঘটনা ও পরবর্তী কিছু ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমরা প্রায় ২০জন সংগঠিত হয়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি, আমাদের গ্রামের অনতিদুরে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে ভারতে যাই। মুশিদাবাদ জেলার শেখপাড়া (বাওনাবাদ) ট্রান্‌জিট ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাই। সেখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর ১৩ই মে সকালে ক্যাম্প কমান্ডার আমাদের ২০ জনকে সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করে ট্রাক যোগে পাঠায়ে দেন। বহরমপুর সেনানিবাসে পৌঁছে জানতে পারলাম আমরা নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছি। ঐ দিনই দুপুরের মধ্যে পলাশীর সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ময়দানের পার্শ্বে ডাকবাংলোতে গিয়ে উপস্থিত হই এবং বিশ্বখ্যাত নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য C2P ক্যাম্পে যোগদান করি। C2P ক্যাম্পে দেয়া আমার নৌকমান্ডো নং ০০৩৩।

## ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা

১৯৭১ সনে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত ৮ জন বাঙালি সাবমেরিনার ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে গোপনে ফ্রান্স হতে পালিয়ে ভারতে আসেন। তারা ভারতে নৌবাহিনী সদর দপ্তরে রিপোর্ট করেন। পরবর্তীতে তাদের উদ্যোগে যুদ্ধ কালীন বাংলাদেশ সেনাপ্রধান ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ পরিকল্পনায় ভারতীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পলাশীতে আমাদের নৌকমান্ডো (সুইসাইড্ স্কোয়াড্) সাংকেতিক নাম C2P ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ঐ ৮ জন বাঙালিই আমাদের ক্যাম্পের মূল প্রশিক্ষক ছিলেন— যাদেরকে আমরা দাদু বলে ডাকতাম। শ্রদ্ধেয় সেই দাদুগণ হলেন সর্ব জনাব মোঃ রহমত উল্লাহ, মোঃ মোশারফ হোসেন, মরহুম আমান উল্লাহ শেখ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (এ ডাব্লিউ, চৌধুরী), মোঃ বদিউল আলম, মোঃ আহসান উল্লাহ, মোঃ আবিদুর রহমান ও মরহুম আঃ রকীব মিঞা (যুদ্ধে শহীদ হন)।

## প্রশিক্ষণ

যোগদানের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে আমাদেরকে ভাগীরথী নদীর ধারে পলাশীর যুদ্ধ ময়দানের ফাঁকা মাঠে নেয়া হয়। অতঃপর তাঁবু খাটায়ে রাত যাপন করা হয়। ২/১

দিনের মধ্যেই পার্শ্বের বাবলা বনের জংলা পরিষ্কার করে তাঁবু স্থানান্তর করা হয়। শুরু হয় পূর্ণ প্রশিক্ষণ। প্রতিদিন ভোর ৫-৩০ মিঃ এ সকলকে ঘুম থেকে হুইসেল মারফত জাগানো হত। তারঃপর ৩০ মিনিটের মধ্যে টয়লেট সম্পন্ন ও মুখ হাত ধুয়ে প্যারেড পিটির জন্য তৈরি হয়ে ঠিক ৬ টায় লাইনে দাঁড়াতে হত। ৭টা পর্যন্ত পুরো ১ ঘণ্টা প্যারেড পিটি (শারীরিক ব্যয়াম) হত। সকাল ৭টা থেকে ৭-৪৫ মিঃ পর্যন্ত নাস্তা ও তাবু গোছগাছ ইত্যাদির জন্য বিরতি। ৭-৪৫ মিঃ এ জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'— পরিবেশিত হত।

সকাল ৮টা হতে প্রশিক্ষণ শুরু হত। ক্যাম্পে সমস্ত ক্যাডেটকে দুই দলে বিভক্ত করে এক দলকে সাঁতারের জন্য পানিতে অন্য দলকে আন-আর্মড কমব্যাট বা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ শিক্ষার জন্য মাঠে পাঠানো হত। এ সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য পোষাক একমাত্র সুইমিং কস্টিউম (জাঙ্গিয়া) ব্যবহার করা হত। পানির দলকে সাঁতারের জন্য ফিনস্ (হাঁসের পায়ের মতো রাবারের জুতা) পায়ে দিয়ে সমস্ত শরীর পানির নিচে রেখে শুধুমাত্র নাক ও মুখমণ্ডল ভাসায়ে চিৎ হয়ে শুধু পা দিয়ে ঠেলে এক অভিনব কায়দায় সাঁতার কেটে পিছনে যাওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হত। পানির নিচে দীর্ঘক্ষণ ডুব দিয়ে থাকার অভ্যাস করানোও এই প্রশিক্ষণের একটি অংশ।

**মাঠের প্রশিক্ষণ :**

নানা রকম প্যারেড পিটিসহ আন-আর্মড কমবাট শিক্ষা দেয়া হত। একটানা ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এই প্রশিক্ষণ চলত। অতঃপর ৩০ মিনিট বিরতি। এ সময় সমস্ত ক্যাডেটকে লেমন জুস্ ও হালকা নাস্তা পরিবেশন করা হত। ১১টা হতে আবারওপ্রশিক্ষণ শুরু হত। এবারে পানির দলকে বদলায়ে মাঠে আবার মাঠের দলকে পানিতে পাঠানো হত। প্রশিক্ষণ চলত একটানা ২ ঘণ্টা অর্থাৎ দুপুর ১ টা পর্যন্ত। ১ টা হতে ৪টা পর্যন্ত বিরতি। এ সময়ে দুপুরের খাবার, বিশ্রাম, বৈকালীন চা-নাস্তা ইত্যাদি দেওয়া হত। বিকাল ৪ টায় শুরু হত বৈকালীন প্রোগ্রাম। ক্যাম্পের সমস্ত ক্যাডেটকে আবারও ২ ভাগে ভাগ করে এক দল প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনেস্ট্রষ্ট্রেশান (অর্থাৎ যুদ্ধ বিষয়ক অস্ত্রের বাস্তব ব্যবহার) যেমন জাহাজে লিমপেট মাইন লাগানো, গ্রেনেড নিক্ষেপ, এসএমসি চালানো, রেকি চলা, এ্যামবুশ করা ইত্যাদির ওপর ক্লাস নেয়া হত ও হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হত।

অন্য দলের ক্যাডেটরা মাঠে ফুটবল, ভলিবল, পানিতে ওয়াটার পোলো ইত্যাদি বিভিন্ন রকম খেলাধুলা করত। মাঝামাঝি সময়ে দলকে বদলায়ে দেয়া হত। এইভাবে চলত সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৭টায় রাতের খাবার পরিবেশন করা হত। রাতের খাবার শেষ রাত ১০টা পর্যন্ত খবরের কাগজ পাঠ, কেরাম বোর্ড খেলা, লুডু খেলা, গান বাজনা করা, ড্রামা থিয়েটার করা ইত্যাদি চলত। রাত ১০টা বাজলে আলো নিভিয়ে সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে শুয়ে পড়তে হত এবং ঘুমাতে হত।

তাছাড়াও প্রত্যেক ক্যাডেটের জন্য সপ্তাহে ২ দিন রাত ১২টা হতে ২টা পর্যন্ত (২ ঘণ্টা) নদীতে নাইট সুইমিং প্র্যাকটিস, ২ দিন রাতে পাহারা ও ২ দিন কুক ডিউটি (বাবুর্চির সাহায্যের জন্য) পড়ত। এই ছিল মোটামুটি দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের বর্ণনা।

## অপারেশন

প্রায় তিন মাস প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা সমুদ্র বন্দরসহ প্রধান প্রধান নদী বন্দরে একই সময়ে একই তারিখে আক্রমণ করে বন্দরে রক্ষিত জাহাজে মাইন লাগায়ে জাহাজ ধ্বংস বা ডুবায়ে বন্দর ব্লক করার লক্ষে ক্যাম্পের ১৬০ জন চৌকস্ নৌকমান্ডো প্রথম অপারেশনের জন্য মনোনীত করা হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জন্য ৬০ জন মনোনীত করা হয়। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অপারেশনে আমিও এক জন অংশগ্রহণকারী। যুদ্ধে-ব্যবহারের জন্য ক্যাম্প হতে জনপ্রতি ১টি লিমপেট মাইন, সাঁতারের জন্য ১ জোড়া রাবারের তৈরি ফিনস্, আত্মরক্ষার জন্য ১টি হ্যান্ডগ্রেনেড, উভয় দিকে ধারাল চামড়ার খোলসে ভরা ১টি ডেগার, এবং প্রতি একটি করে ৯ মি. মি. এসএমসি (সাব-মেশিন কাররাইন) সঙ্গে প্রয়োনীয় ম্যাগ্জিন ও গুলির বাক্স সরবরাহ করা হয়। নিজস্ব কাপড় চোপড়সহ সব মিলিয়ে জনপ্রতি কমপক্ষে প্রায় ২৫ কেজির মত ওজন দাঁড়ায় যা লুঙ্গিতে বেঁধে নেয়া হয়। ২রা আগস্ট আমরা চট্টগ্রামের ৬০ জন আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদু এ ডাব্লিউ চৌধুরীর নেতৃত্বে অপারেশন জ্যাকপটের উদ্দ্যেশ্য রাতের ২টি ট্রাকযোগে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাই এবং কলকাতার ব্যারাকপুর সেনানিবাসে পৌছাই। দমদম বিমানবন্দর হতে ডাকোটা বিমানযোগে আমাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বিমান বন্দরে নেয়া হয়। আগরতলা বিমানবন্দর হতে কয়েক কি. মি. দূরে এক টিলার উপরে আমাদের জন্য অস্থায়ীভাবে তৈরি 'নিউ ইয়থ ক্যাম্প'-এ নেয়া হয়। সেখানে ২-৩ দিন অবস্থান শেষে ট্রাকযোগে প্রথমে হরিণা ক্যাম্পে পরবর্তীতে বাংলাদেশের কুমিল্লার সীমান্তে পোংবাড়ি ক্যাম্পে নেয়া হয়। এই ক্যাম্প থেকেই দেশের ভিতরে ঢোকার পালা। আমাদের ৬০ জনকে তিন দলে বিভক্ত করে এককে জন গাইডের অধীনে দাঁড় করালেন। এই পোংবাড়ি ক্যাম্প হতে ১ কি.মি. এর কম দূরত্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড। রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে আমরা প্রথম ২০ জন আমাদের গাইডের অধীনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের নিকটে জংগলের পাশে দাঁড়াই এবং লক্ষ করি যে মাঝে মধ্যেই পাক সেনার গাড়ি রাস্তায় টহল দিচ্ছে এবং রাস্তার দুধারে বাংকারে ঘন ঘন হারিকেন জ্বলছে। এহেন পরিস্থিতিতে রোড পার হওয়াটাই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ-তবুও যেতে হবে। সমস্ত মাল সামানা লুঙ্গি ও গামছা দিয়ে পিঠে বেঁধে নেয়া হল। অতঃপর যেই পাক সেনার গাড়ি টহল দিয়ে এক দিকে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে আমরা ৪/৫ জন ক্রলিং করে রাস্তা পার হয়ে অতি সাবধানে ও দ্রুতগতিতে একটু ভিতরে আমাদের জন্য অপেক্ষামান আরেকজন গাইডের নিকট পৌছাই। প্রায় ৩০/৪০ মিনিটের মধ্যেই আমাদের দলের ২০ জন একত্রে হতেই আমাদের গাইড আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। বলাবাহুল্য তিন দলকে তিন পথে নিয়ে এক জায়গায় নেয়া হবে। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পথ আল্লাহকে স্মরণ করে গাইডের

পিছনে হাঁটা দিলাম। গাইডের পিছনে সারারাত হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে, বীভিৎস অন্ধকারে কখনও অনেক খাল বিল, ছোট খাটো নদী নালা, পাহাড়-টিলা এবং জংগল ইত্যাদি পার হয়ে আনুমানিক ২০ কি. মি. রাস্তা অতিক্রম করে, রাত শেষ হওয়ার পূর্বেই নির্ধারিত শেলটারে পৌছলাম। দিনভর সেই আশ্রয়ে বিশ্রাম নিয়ে পরের রাতে আবারও একইভাবে রাতভর হেঁটে পরবর্তী আশ্রয়স্থলে পৌছাই। এইভাবে ৫/৬ রাত-রাতভর হেঁটে আমরা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার "সমিতি বাজার" নামক স্থানে পৌছাই। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে সেখানের আশ্রয়স্থলে স্থানীয় গাইডের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রশস্ত্র সব জমা রেখে আমরা ২/৩ জন করে খালি হাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে এসে বাসযোগে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ১৩ই আগস্ট 'সবুজবাগ' বাড়িতে আমরা দুই দল অর্থাৎ ৪০ জন পৌছাই। ইতিমধ্যে ১৩ই আগস্টেই স্বাধীন বাংলা বেতার হতে সকাল ৭ টার খবরের পর 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান'- পংকজ কুমার মল্লিকের এই গানের মাধ্যমে অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য সংকেত পাঠানো হয়। যার অর্থ শুধু আমাদে: দলপতি এ ডাব্লিউ চৌধুরী সাহেবই জানতেন। এই সংকেত প্রাপ্তির ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যেদিন পরবর্তী সংকেত আসবে সেই দিনই রাত ১টায় অপারেশন করতে হবে। ১৪ই আগস্ট চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করে ৪/৫ জন করে স্থানীয় গাইডের সঙ্গে নৌকাযোগে কর্নফুলী নদী পার হয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে জেটির অপর পাড়ে 'লক্ষ্যারচরে' এক খামারবাড়িতে কৃষি কাজের শ্রমিক পরিচয়ে আশ্রয় নিই। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনবাংলা বেতার হতে সকাল ৭ টার খবরের পরে একই সময়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি'— গানের মাধ্যমে অপারেশন সংকেত আসে। সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েকটি শাকসবজির বস্তায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্র খামারবাড়িতে পৌছে যায়। উল্লেখ্য যে চট্টগ্রাম শহরের কয়েকজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ী এ্যামবুলেন্স ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর গাড়িযোগে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে "সমিতি বাজার" হতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চট্টগ্রাম শহরের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে আনেন এবং পরবর্তীতে শাকসবজির বস্তায় ভরে নৌকা যোগে খামারবাড়িতে সময়মতো পৌছে দেন। রাত ১০টার পর শ্রদ্ধেয় দাদু এ ডাব্লিউ চৌধুরী সাহেবের কথামতো শাকসবজির বস্তা খুলে অস্ত্রশস্ত্র বের করা হয়। অতঃপর দাদু সকলকে অপারেশানের বিষয়টি জানালেন এবং অপারেশানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রতিজনকে একটি করে লিমপেট মাইন, সাঁতারের জন্য এক জোড়া ফিনজ, আত্মরক্ষা/সুইসাইড করার জন্য একটি করে হ্যান্ড গ্রনেড এবং দুই ধারে ধারালো চামড়ার খোলসে ভরা একটি ডেগার ভাগ করে দেন। এবার অপারেশনের পালা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও প্রতিকূল অবস্থায় পোংবাড়ি ক্যাম্প হতে ফেনী জেলার "সমিতি বাজার" পর্যন্ত দীর্ঘপথ ৫/৬ রাত হেঁটে আমাদের মধ্যে ৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা ৩৩ জন অপারেশানে অংশগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। উল্লেখ্য যে দলপতির নির্দেশে আমরা ৪/৫ জন করে পর্যায়ক্রমে দিনের বেলায় খামারবাড়ির পাশে কর্ণফুলী নদীর পাড়ে প্রায় ২ কি. মি. এ দিক ও দিক ঘোরাফেরা করে রেকি করে দেখি এবং নদীতে নামা ওঠাসহ খামারবাড়িতে আসা যাওয়ার রাস্তা ঠিকঠাক করে নিই।

১৫ই আগস্ট, পরিষ্কার চাঁদনী রাত, রাত ১২.৩০ মি. বাজলে আমরা ৩৩ জন নদীর পাড়ে যাই। প্রতি জাহাজে দুই সাইডে ও মাঝে ৩টি মাইন লাগোনোর জন্য ৩ জন করে গ্রুপ করা এবং কে কোন জাহাজে মাইন লাগাবে তা আমাদের দলপতি ঠিক করে দেন। আমাদের গ্রুপের জন্য একটি আলোকিত জাহাজ নির্ধারিত হয়। জাহাজের ইঞ্জিন রুম কোনোটার সাইডে আবার কোনোটার মাঝে। কাজেই ইঞ্জিন রুমকে সরাসরি হিট করার জন্যই প্রতি জাহাজে ৩টি করে মাইন লাগানোর সিদ্ধান্ত ছিল। নদীর অপর সাইডে জেটির জাহাজকে টার্গেট মতো নদীর পাড়ে নিজ নিজ গ্রুপের ৩ জন করে আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণ করি। আমাদের গ্রুপে আমি অপারেশন গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত হই। আমার গ্রুপে অন্য যে ২ জন ছিলেন তারা হলেন চট্টগ্রামের মোঃ আবুল বাশার (মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পূর্বে ইন্টারমিয়েটের ছাত্র) ও মোঃ মাজাহার উল্লহ (মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পূর্বে পাক সার্ভিসে ছিলেন, পরবর্তীতে বীর উত্তম)। আমি তাদের ২ জনকে জাহাজের দুই সাইডে মাইন লাগানোর জন্য জানাই এবং আমি নিজে জাহাজের মাঝে মাইন লাগানোর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করি। জেটিতে অপারেশান টার্গেট ও নদীর অপর পাড়ে আমাদের অবস্থান গ্রহণ, সাঁতার শুরু ও অপারেশন শেষে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি নিচের ছবিতে দেখানো হল



জেটিতে টার্গেট (XXX) একটি জাহাজ দেখানো হয়েছে। দুই সাইডে ও মাঝে (৩টি × চিহ্ন) পজিশনে লিমপেট মাইন লাগানো হয়েছে। নদীর পাড়ে দুইটি চিহ্ন দেখানো হয়েছে— একটি হতে সাঁতার শুরু এবং অন্যটি হতে অপারেশন শেষে প্রত্যাবর্তন (⟶) চিহ্ন দিয়ে স্রোতের গতি ও সাঁতারের গতি দেখানো হয়েছে।

রাত ১টা বাজলে নিজ নিজ টার্গেটে আঘাত হানার লক্ষে আমরা ফিনস্ পায়ে দিয়ে গ্রেনেড ও ডেগার কোমরে বেঁধে এবং বাম হাতে লিমপেট মাইন বুকের উপর ধরে আল্লাহকে স্মরণ করে আমাদের কমান্ডো কায়দায় সাঁতার শুরু করি। সমস্ত শরীর পানির নিচে ডুবায়ে শুধু চোখ, মুখ, নাক পানির উপর ভাসায়ে চিৎ হয়ে বিশেষ এক অভিনব কায়দায় সাঁতার কেটে পিছনে যেতে থাকি। কর্নফুলী নদী জোয়ার ভাটার নদী। সে সময় নদীতে ভাটা ছিল-অত্যন্ত খরস্রোতা সে অবস্থা। নদীতে এহেন খরস্রোতা পরিস্থিতিতে

বেশ কিছুক্ষণ একত্রে সাঁতার কাটার পর নদীর প্রায় মাঝ পথে এসে আমার সাথী আবুল বাশারকে রেখে আমি একাকী সাঁতার কেটে আমাদের আলোকিত টার্গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। বেশ কিছু দূর থেকেই জাহাজের নাম "হরমুজ" পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছিল। এটি একটি পাকিস্তানি জাহাজ ছিল। মাঝে মধ্যে উল্টে কাঙ্ক্ষিত টার্গেট 'হরমুজ' জাহাজের দিকে ঠিকমতো যাচ্ছি কিনা-তা দেখে নিই। এমনিভাবে দীর্ঘ সময় একাকী সাঁতার কাঁটার পর কাঙ্ক্ষিত টার্গেট 'হরমুজ' জাহাজের নিকট পৌঁছলাম। জাহাজের ইঞ্জিন চালু ছিল। চাঁদনী রাতে মনে হলো জাহাজটি লম্বায় প্রায় ৫০০ ফিট হবে। জাহাজের কাছে পৌঁছে ইঞ্জিনের তথা জাহাজের শন শন শব্দে ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো। উপরন্তু নদীর সাইডে জাহাজে আলো দেয়া আছে আবার জাহাজে লোড/আন লোডের কাজও চলছে। লোকজনের সমাগমের শব্দ বুঝা যাচ্ছে। তবে জাহাজের নিচের অংশ স্ল্যান্টিং হয়ে নৌকার মতো সরু হওয়ায় জাহাজের পাশে পানির উপর প্রায় ৩-৪ ফুট জায়গা বরাবর ছায়া ছিল। আমার পালা জাহাজের মাঝখানে লিমপেট্ মাইন লাগানো। লিমপেট মাইন লাগানের সেই গুরু দায়িত্ব মাথায় রেখে সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে জাহাজের পাশের সেই ছায়ার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজ ঘেঁষে আস্তে আস্তে জাহাজের মধ্যখানে উপস্থিত হই।

লিমপেট মাইন পানির প্রায় ৩-৪ ফুট নিচে লাগানোর নিয়ম। কারণ লিমপেট মাইন বিষ্ফেরণের ফলে জাহাজে একটি বড় ধরনের গর্ত হবে এবং গর্ত দিয়ে পানি ঢুকতে থাকবে। আর বিস্ফোরণের বিরাট ধাক্কায় জাহাজটি যে কোনো দিকে কাত হয়ে যেতে পারে। তাই পানির ৩-৪ ফুট নিচে মাইন লাগানোর উদ্দেশ্যে হল বিস্ফোরণের ধাক্কায় জাহাজটি যে কোনো দিকে কাত হলেও যেন বিষ্ফোরণে তৈরি গর্তটি পানির নিচেই থাকে এবং পানি ঢুকতেই থাকে। আর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো মাইন বিষ্ফোরনে জাহাজটি সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হয়ে পানি ঢুকে ডুবে গিয়ে বন্দর ব্লক হয়ে যাওয়া।

লিমপেট শব্দের অর্থ স্বয়ক্রিয় যা তাপে, চাপে, যেকোনোভাবে যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। মূল বারুদ একটি পাটশোলা জাতীয় পদার্থের মধ্যে রাখা ছিল। এই মাইনের আকৃতি দেখতে হুবহু কচ্ছপের মত ছিল। মাইনের তলায় উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পাঁচ টুকরা হর্স-সু ম্যাগনেট (ঘোড়ার পায়ের আকৃতির চুম্বক) সেট করা ছিল। আর চুম্বক থাকায় মাইনটি জাহাজে লাগানও খুবই সহজ ছিল। প্রায় ২-৩ ফুট দূর হতেই আকর্ষণে জাহাজে লেগে যেত। মাইনটি একটি টাইম বোমা যাতে ডিলে টাইম হিসাবে একটি সল্ট ব্লক ব্যবহার করা হত-যা রাবারক্যাপ খুলে দেয়া সাপেক্ষে গলতে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে অর্থাৎ ১ ঘণ্টা পরেই বিষ্ফোরণ ঘটবে। আর এই সময়ের মধ্যে কমান্ডোগণ নদী পাড়ি দিয়ে অপর পারে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারবে। মাইন বহনে নিরাপত্তার জন্য ডবল সেফটি ডিভাইস ব্যবহার করা হত। (১) একটি সেফটি পিন বসানো থাকত (২) সেফটি ডিভাইসকে একটি রাবার ক্যাপ দ্বারা ঢাকা থাকত। মাইনটি লাগানোর পর প্রথমে রাবার ক্যাপ পরে সেফটি পিন খুলে দিলে তবেই মাইনটি এ্যাকশানে যাবে বা detonated হবে।

**জাহাজে মাইন লাগানো :**

আল্লাহকে স্মরণ করে নিয়ম মাফিক মাইন লাগানোর জন্য লম্বা শ্বাস নিয়ে পানিতে ডুব দিয়ে প্রায় ৪ ফুট নিচে যাই এবং জাহাজের গায়ে মাইনটি লাগাই (মাইনের তলায় চুম্বক থাকায় সহজেই লাগানো হয়েছে)। এবার সেফটি ডিভাইস খোলার পালা—

প্রথমে রাবার ক্যাপ পরে সেফটি পিন। কর্নফুলী নদীতে সে সময় ভাটা ছিল এবং তীব্র স্রোতের ফলে রাবার ক্যাপটি এয়ারটাইট হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও রাবার কাপটি খুলতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাবার ক্যাপটি খুলে ফেলি তারপর এইভাবে দাঁত দিয়ে সেফটি পিনও টেনে বের করে ফেলি। আর একাজে অনেক সময় লেগে যায়। ফলে আমার দম প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অথচ প্রশিক্ষণে পানির নিচে আমি ডুব দিয়ে প্রায় ২৫ মিনিট থাকতে পারতাম। যাহোক তাড়াতাড়ি শ্বাস নেয়ার জন্য আমি উপরে আসার লক্ষে জাহাজ থেকে হাত ছেড়ে দিই। জাহাজ থেকে হাত সরানো মাত্রই স্রোতের টানে আলোর মধ্যে ভেসে উঠি। আর পানির উপরে ভেসে উঠতেই জাহাজে পাহারারত পাকসেনারা আমাকে দেখে ফেলে। এই অবস্থায় হঠাৎ করে আল্লাহর রহমতে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আমি সজোরে পানির উপরে আরও বেশি ভেসে উঠি এবং লম্বা নিশ্বাস নিয়ে নদীতে শুশুক ঘাড়াল এর কায়দায় ডিগবাজি দিয়ে আবার পানিতে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করি। প্রথমে আমি স্রোতের সঙ্গে সজোরে সাঁতার কেটে অনেক দূরে চলে যাই। তারপর পানির উপরে নাক, মুখ, চোখ ভাসায়ে কমান্ডোর কায়দায় সাঁতার কাটতে থাকি। এমতাবস্থায় লক্ষ করলাম আমার মাইন লাগানো 'হরমুজ' জাহাজে পাহারারত পাকসেনারা সার্চ লাইট দিয়ে জাহাজের আশে পাশে খোঁজাখুজি করছে— ভাবলাম এতে অন্যদের অবশ্যই অসুবিধা হবে। যাহোক একাকী সাঁতার কেটে চলেছি, সঙ্গে কেউ নাই, অন্যদের কোনো খবরও জানি না, কোথায় যাচ্ছি তাও জানি না, তখন নদীতে হাঙ্গর কুমিরের কোনো ভয় নাই, ডোবার ভয় নাই, শুধু নিরাপদে আশ্রয়ে লক্ষে সাঁতারায়ে চলেছি। ডানে তাকালে শুধু পানি আর পানি সমুদ্র মোহনা-তথা সমুদ্র। সামনে তাকালে অদুরে নদীর অপরপাড়ে একটি জংগল মনে হয়। অতঃপর সে দিকেই সাঁতার কেটে চললাম। নদীর অপর পাড়ের প্রায় কাছাকাছি এসেছি পাড়ের দিকে তাকাতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল-মনে হল একজন পাকসেনা রাইফেল হাতে শোয়া অবস্থায় নদীর দিকে তাক্ করে আছে। প্রথমে ভয় পেলাম। ভাসমান অবস্থায় প্রায় ১০/১২ মি. অপেক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করলাম-কোনোরকম নড়া চড়া নাই। জীবিত মানুষ/জীবজন্তু যাইহোক না কেন অবশ্যই একটু নড়া চড়া করবে। অত্যন্ত সাহসে ভর করে সামনে নদীর পাড়ের দিকে আগালাম এবং কিছু দূর থেকে এক মজার কাণ্ড দেখলাম একটি গাছের মোটা শিকড় নদীর পাড়ে পড়ে আছে যা দেখতে ঐ রকম ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। যাহোক পানি ছেড়ে উঠে সোজা জংগলে ঢুকতে লাগলাম। নির্দেশনা সত্ত্বেও নদী থেকে উঠার সময় কোনোরকম কোনো অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেই নাই। কারণ অচেনা অদেখা একটু নতুন জায়গা তারপর একাকী জংগলে ঢুকে যাচ্ছি। সে সময় জংগলে বাঘ, ভাল্লুক, সাপ-বিচ্ছু কোনো কিছুরই ভয় লাগে নাই কারণ জাহাজে মাইন

লাগানোর আনন্দই আমাকে এহেন ভয় ভীতির উর্দ্ধে নিয়েছে। জংগলে কিছু দূর ঢুকে যেতেই বেতের ঝাঁড়, বেতের কাঁটায় সমস্ত শরীর কেটে যাচ্ছে তাতে কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ নাই। জংগলের ভিতরে যেতে যেতে যখন বেশি পানি হল তখন ফিনস্ পায়ে আবারও সাঁতার দিয়ে যেতে লাগালাম। অদূরে জোড়া খেজুর গাছ নজরে পড়ল। অনুমান-করলাম পাশেই লোকালয় হতে পারে। তারপর সাঁতরিয়ে ঐ জোড়া খেজুর গাছের নিকট পৌঁছে তীর পেলাম। সমস্ত অস্ত্রস্ত্র পানিতে ফেলে উপরে উঠলাম। অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে আকাশের তারকা লক্ষ করে খামারবাড়ি পৌঁছানোর লক্ষে মহল্লার দিকে একাকী চললাম। মহল্লা পার হয়ে মাঠ পেলাম। মাঠ ধানক্ষেতে ভরা। আমি একাকী ধানক্ষেত পাড়ি দিয়ে চলেছি। এক পর্যায়ে একটি খাল পেলাম। প্রথম দিন নৌকায় নদী পার হয়ে এই খালেই আমরা নৌকা ভিড়ায়ে খামারবাড়িতে গিয়েছিলাম। সাঁতার কেটে খাল পার হলাম। খালের উপর উঠে অপর পাড়ে জেটির দিকে তাকাতেই রাইফেল গর্জে উঠলো। সাঁ সাঁ শব্দে রাইফেলের গুলি এসে আমার আসে পাশেই পড়তে লাগলো-বুঝলাম আমাকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জড়োসড়ো হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। পর পর আরও ১০-১২ রাউন্ড গুলি এসে আমার আশে পাশে কয়েক গজের মধ্যেই পড়ল। গুলি ছোড়া বন্ধ হতেই আমি ক্রলিং করে পাশের ধানক্ষেতে ঢুকে পড়লাম। ইতোমধ্যেই জেটিতে প্রথম মাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। তখন জেটি হতে হৈ চৈ এর শব্দ ভেসে আসতে থাকল। সাফল্যের আনন্দে অতি সাবধানে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে দ্রুত খামারবাড়িতে এসে পৌঁছলাম। সামান্য পরে আবারো মাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা গেল। খামারবাড়িতে পৌঁছেই জানলাম ইতোমধ্যে অপারেশন শেষে ফিরে কয়েক ব্যাচ (৪-৫ জন) গাইডের মাধ্যমে ২০-২৫ জন নিরাপদে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে খামারবাড়ি ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি পৌঁছার পর ৪/৫ জন একত্রে হতেই পুনরায় আরেকজন গাইডের মাধ্যমে আমাদেরকে খামারবাড়ি হতে পাঠায়ে দেয়া হল। এদিকে একের পর এক মাইন বিস্ফোরণের বিকট বিকট শব্দ ভেসে আসতে লাগল। রাত তখন অনুমানিক ৪টা হবে গাইড জানালেন রাত থাকতেই নিদ্দিষ্ট শেলটারে প্রায় ১২/১৪ কি. মি. যেতে হবে। তাই আমরা কখনও ডবল মার্চ করে কখনও বা দৌড়ায়ে যেতে লাগলাম। দৌড়ে পালাচ্ছি কিছু দূর যেতেই নদীতে অঁ-অঁ শব্দে সাইরেন বাজতে শুরু করলো। সে কী করুণ ও ভয়াবহ সেই সাইরেনের শব্দ। লিমপেট মাইন বিষ্ফোরণের সেই বিকট শব্দ এবং ভয়াবহ সাইরনের সেই শব্দ আজও ভুলি নাই এবং কোনো দিন ভুলবো না। ইতোমধ্যে পাকসেনারা নদীতে গানবোট নামায়ে সার্চ লাইট দিয়ে তল্লাশি শুরু করে। যে সার্চ লাইটের আলো নদীর পাড়ের কয়েক কিলোমিটার ভিতরে আমাদের রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে। যতদূর মনে পড়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ২৩টি মাইন বিষ্ফোরণের শব্দ শুনেছি এবং স্বাধীনতার পর জেনেছি প্রায় ১০/১২টি জাহাজ/বার্জ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পানিতে ডুবে বন্দর ব্লক হয়ে গিয়েছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর রাত শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা নিদ্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে এসে পৌঁছলাম। ১৬ই আগস্ট এ আশ্রয় স্থলে আমরা দুপুর পুর্যন্ত অবস্থান

করি। ৪/৫ জন করে পর্যায়ক্রমে নৌকা যোগে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম শহরের এসে বাসযোগে আগ্রাবাদের পূর্বের সেই আশ্রয়স্থলে ফিরে যাই। আমাদের এই অপারেশানে এস এম মাওলাসহ ২ জন পাক সেনার হাতে ধরা পড়ে এবং তাদেরকে অমানবিক অত্যাচার করা হয় এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত আটকায়ে রাখে। স্বাধীনতার পর তারা ছাড়া পায়।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে সফল অপারেশন শেষে আমরা গর্বের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করে যেভাবে চট্টগ্রাম এসেছিলাম ঠিক সেইভাবেই চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাই এবং ভারতের পলাশীতে আমাদের সি২পি ক্যাম্পে ফিরে যাই।

আমার বিশ্বাস চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে জাহাজ ধ্বংসের এবং নিমজ্জিত করার অপারেশান স্বাধীনতা যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই অপারেশানের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে স্বীকার করে নাই এবং যুদ্ধকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বিশৃংখলা বলে বহির্বিশ্বে ঘোষণা দিয়ে আসছিল। কিন্তু আমাদের এই অপারেশান সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাকিস্তান সরকারও এই নৌ-কমান্ডো আক্রমণের বিষয় স্বীকার করে। পাকিস্তান সরকারের এই স্বীকারোক্তি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়-ত্বরান্বিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সেই সাথে আমাদের এই অপারেশন জ্যাকপট নন্দিত হয়-বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। বিশ্বব্যাপী তথা যুদ্ধ বিশারদগণই যুদ্ধের মূল্যায়ন করেছেন।

**মোহাম্মদ ফজলুল হক**

জন্ম ৩০শে জুন ১৯৫২, রাজশাহী। শিক্ষা ১৯৬৭ সালে রাজশাহীর মাটিকাটাদিঘী বহুমুখি কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৬৯ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি। অতপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স। ১৯৭৮-৭৯ সালে ঢাকায় Institute of Scientific Instrumentation (ISI) থেকে ইলেকট্রনিক্স-এ বিশেষ প্রশিক্ষন লাভ।

মোহাম্মদ ফজলুল হক বর্তমানে প্রিন্সিপাল ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞান ও কারিগরী কারখানা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন।

# স্বাধীনতা যুদ্ধে একটি পদাতিক প্লাটুনের অভিযান

মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী, বীর বিক্রম

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মহালছড়ি-বুড়িঘাট এলাকায় যুদ্ধে শহীদ ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীর উত্তম (২৭শে এপ্রিল মহালছড়ি যুদ্ধে শহীদ হন) ভীতসন্ত্রস্ত এমজিওয়ালা থেকে এম জি (মেশিনগান)-টি কেড়ে নিয়ে নিজেই ফায়ার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেড়ে নেয়ার সময় তিনি হ্যান্ডেলটা না ধরে এমজি'র ব্যারেল বাঁ হাত দিয়ে ধরেছিলেন। উত্তপ্ত ব্যারেল তার হাতের তালু ঝলসে ফেলে। বাঁ হাত নিকটবর্তী কাদাতে ঢুকিয়ে ডান হাত দিয়ে অবশ্য ফায়ার অব্যাহিত রাখেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, অস্ত্র প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষক সব সময় ব্যারেলে হাত না রাখার কথা বলে থাকেন এবং সেমতে এমজি ফায়ারের ড্রিল শিখিয়ে থাকেন। ছোট এই শিক্ষণীয় বিষয়টি যুদ্ধে কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা উপরের বাস্তব ঘটনার বর্ণনা থেকে সহজে অনুমেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই ছোট ঘটনাগুলো ধরে রেখে তার চেয়েও ছোট ছোট শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে আগামী দিনের পাথেয় হিসেবে রাখার উদ্দেশ্যেই এই লেখা। সে হিসেবে আমরা একটি প্লাটুনের অভিযানকে পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করি। এই প্লাটুনটি হচ্ছে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭নং প্লাটুন। যার অধিনায়ক ছিলেন সুবেদার আবদুল ওহাব, বীর বিক্রম। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার হাওলাদার, বীর উত্তম।

সুবেদার আবদুল ওহাব ও নায়েব সুবেদার মংগল মিয়াকে একাত্তরে যুদ্ধের এলাকাসমূহে রেজমিনে নিয়ে যাওয়ার পরও সাথীদের পূর্ণাংগ নাম ঠিকানা, নিজস্ব দলের সংখ্যা, শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্ত্রের সঠিক অবস্থানগুলো এত বছর পর আর সঠিকভাবে দেখাতে বা মনে রাখতে পারেননি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাদের বক্তব্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের মাঝে যথেষ্ট মিল রয়েছে, যা তাদের বক্তব্যের সততার স্বপক্ষেই রায় দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রেরিত মুক্তিবাহিনীর সিচুয়েশান (Situation) রিপোর্টগুলো আমাদের হাতে নেই তা না হলে বক্তব্য, বিশেষ করে নামধাম ও দুশমনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা যেত। যাচাই করা আরো সহজ হত যদি পাকিস্তানি রিপোর্টগুলো মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া যেত। অবশ্য আমরা বক্তব্য বা ফলাফলের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে বেশি আগ্রহী।

২নং সেক্টরের অধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা ও মন্দভাগ অতি পরিচিত নাম। এত বছর পর আজো ঐ এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এক লহমায় সুবেদার (যে নামে তিনি পরিচিত) ওহাবকে চিনেছিল এবং তার ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত সততা ও দুঃসাহসিকতার জন্য এলাকাবাসী আজও তাকে নিয়ে গর্ব করে। দূর দূরান্ত থেকে লোক এসেছিল তাকে এক নজর দেখার জন্য। সুবেদার আবদুল ওহাব ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার রাজামেহের ইউনিয়নে মরিচা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল কুমিল্লায় দেবিদ্বার থানার জাফরগঞ্জ ডাক বাংলোতে অবস্থানকালে ক্যাপ্টেন আবদুল গনি তাকে সেনাবাহিনীতে রিক্রুট করেন। সেনাবাহিনীতে ফুটবল খেলায় একজন দক্ষ গোলকিপার হিসেবে সর্বস্তরে তার পরিচিতি ছিল। ১৯৬৩ সালে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলী হন। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে লাহোর থেকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সাথে বদলী হয়ে কুমিল্লা আসেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের 'সি' বা চার্লি কোম্পানি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে। এ সময় ২৬শে মার্চের পর প্রথমে মেজর সাফায়েত জামিল, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ও পরে মেজর খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তমের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তখন সুবেদার ওহাব চার্লি কোম্পানির ৭নং প্লাটুনের কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তিনি বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

## শালগড় অভিযান

মুক্তিযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করার আগে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে কিংবা মে মাসের শুরুতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল ৭ নম্বর প্লাটুন কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়কের উপর বড় শালগড় এলাকায় কুমিল্লার দিক থেকে আগত প্রায় ২৫/২৮টি গাড়ির বহরের উপর একটি এম্বুশ করে। উক্ত কনভয়ে গাড়ি ও জনবলের তুলনায় এম্বুশ দলের সংখ্যা নিতান্ত কম (২২/২৪ জন) থাকলেও তারা উক্ত কনভয়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করতে সমর্থ হয়। এই অভিযানের ফলে শত্রুর আওতাধীন এলাকার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

যোগাযোগের জন্য পাকবাহিনী কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (সিএন্ডবি) সড়ক নিয়মিত ব্যবহার করতো তা সুবেদার ওহাব জানতে পারেন। তিনি এই সড়কের উপর শত্রুর উপর এম্বুশ করার সুযোগ গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী ১টি মেশিনগান, ১টি ব্লেন্ডিসাইড ও বেশ কয়েকটি লাইট মেশিনগান নিয়ে তার প্লাটুন সীমান্তের ওপারে দেবিদ্বার থেকে মন্দভাগ হয়ে কায়েমপুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে চান্দলা গ্রামে বিকেল চারটার দিকে উপস্থিত হন। সেদিন সেখানে বাজার ছিল বলে তারা লোকজনের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পুকুরের ধারে ঝাড় জঙ্গলে অবস্থান নেন। স্থানীয় মেম্বার পরে তাদেরকে স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে অবস্থান করা তাদের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ছিল বলে স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী উক্ত প্লাটুন খুব ভোরে দু'মাইল পশ্চিমে সিঁদলাই গ্রামে চাঁদ মিয়া মেম্বারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

সকালে সুবেদার ওহাব সাধারণ বেশ ধরে সেখান থেকে শালগড় এলাকায় সিএন্ডবি সড়ক রেকি (পর্যবেক্ষণ) করার সময় উক্ত পথে দু'একটি আর্মির গাড়ির চলাচল দেখতে পান। তিনি রাস্তার অতি নিকটে গিয়ে এম্বুশের স্থান নির্বাচন করেন। ঐ এলাকার জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীর প্রতি তেমন সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করতো না, তাই নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সুবেদার ওহাব রাস্তা ও গ্রাম এড়িয়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে চলাচল করেন।

দুপুরে খাওয়ার পর জনৈক ফকিরের কাছে সংবাদ পাওয়া যায় যে ঐ দিন রাতে সিএন্ডবি সড়কে পাকবাহিনী কারফিউ ঘোষণা করেছে। এতে সুবেদার ওহাব অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে ঐ দিন রাতে উক্ত সড়ক পাক সেনারা চলাচলের জন্য ব্যবহার করবে। সুতরাং ঐ রাতেই এম্বুশ করার সিদ্ধান্ত নেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং ভারী জিনিসপত্র চারজনের তত্ত্বাবধানে রেখে রাতের অন্ধকারে বড় শালগড় এলাকায় সিএন্ডবি সড়কের পাশে ফাঁদ স্থাপন করে। (চিত্র দেখুন)

সুবেদার ওহাব তার দলকে এক সারিতে উত্তর-দক্ষিণ-এ বিস্তৃত করে অবস্থান নেন। তিনি এলএমজি নিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে তৃতীয় বৈদ্যুতিক স্তম্ভের কাছে (আলুক্ষেত) ছিলেন এবং তার কাছাকাছি নায়েক তোফাজ্জল হোসেন সর্ব উত্তরে অবস্থান নেয়।

জায়গা দেখানো ও ব্রিফিংয়ের পর দলকে মোতায়েন না করে প্লাটুন অধিনায়ক সকলকে একসাথে রাখেন (শত্রুর আগমনের দিক জানা ছিল না এবং দলের সদস্যরা তাদের অবস্থানে ঘুমিয়ে পড়তে পারে কিংবা একা থাকলে দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে এ কথা চিন্তা করেই সকলকে একত্রে রাখা হয়)। রাতে আনুমানিক ১২টায় দক্ষিণ দিক থেকে অনেক গাড়ির আলো দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার ওহাব সতর্ক করেন এবং প্রত্যেককে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেন।

শত্রুর অধিকাংশ গাড়ি যখন এম্বুশ এলাকায় প্রবেশ করে তখন এম্বুশ দল গুলিবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু বেবিটেক্সি মনে করে নায়েক তোফাজ্জল প্রথম গাড়িতে ফায়ার করেনি বলে সেটা এম্বুশ এলাকার কিছুটা আগে চলে যায়। প্রথম ৪ মিনিট এম্বুশ দল শত্রুর উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করে।

সুবেদার ওহাব তার দলের গুলিবর্ষণ বন্ধ করে সকলকে স্থান ত্যাগ করতে বলেন (এখানে তিনি সিগন্যাল পিস্তল ব্যবহার করেন)। এই সময় দু'জনকে কভারিং ফায়ার দিতে বলা হয় এবং তারা কমান্ডারের সাথেই সেখান থেকে পশ্চাদনসরণ করে।

এম্বুশস্থল থেকে সৈয়দপুর স্কুল (আর ভি)-এ একজন ছাড়া বাকি সকলেই উপস্থিত হয়। সে পথ ভুলে গিয়েছিল এবং ভয়ে তার এলএমজি ঝোপের মধ্যে ফেলে আসে। পরে সে সরাসরি সিঁদলাইতে গিয়ে দলের সাথে মিলিত হয়।

সিঁদলাইতে চা-নাস্তা খাওয়ার পর উক্ত দল যখন চান্দলা হয়ে মন্দভাগের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে তখন পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হতে শুরু করেছে।

এই অভিযানে শত্রুর দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং সুবেদার ওহাবের মতে ১৮টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মধ্যে ১০টি গাড়ি একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। এতে

কতজন পাকসেনা হতাহত হয় তা জানা যায়নি। তবে উঁচু রাস্তার পশ্চিম পাড়ে আশ্রয় এবং আড় নিয়ে তাদের অনেকেই গুলির আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

বড় শালগড় (নোহাটি) গ্রামের নসু মিয়া, বসু মিয়া, যোগেশ চন্দ্র সূত্রধর, ওদুদ মিয়া তারা সাক্ষ্য দেয় যে অন্তত একটি গাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও নালার ভিতরে আছে। তারা আরো বলে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির পরিমাণ অনেক ছিল বলে সকালে গাড়ি চলাচলে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

মাত্র বিশ জনের একটি অতি ক্ষুদ্র দলের এম্বুশের ফলে শত্রুর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হয়।

এম্বুশ দল তাদের যাতায়াতের নিরাপত্তা এবং পাকবাহিনীর সহযোগিতাকারী স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে মফিজ চেয়ারম্যান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ কর্তৃক চিহ্নিত না হবার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সাফল্য অর্জনে এর বিশেষ প্রয়োজন। লোকজনের সন্দেহ এড়ানোর জন্য তারা তাদের অস্ত্রসমূহ থলিতে বহন করেছিলেন।

কমান্ডার সঠিকভাবে শত্রু কনভয়ের চলাচল অনুমান করতে পেরেছিলেন কিন্তু এ ধরণের অনুমানের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।

যে আকৃতির লক্ষবস্তুর অনুমান করে এম্বুশ লাগানো হয় তার চেয়েও বড় লক্ষবস্তুর আগমন ঘটলেও অধিনায়ক উদ্দেশ্য সাধনে অবিচল থাকতে পারেন যদি পশ্চাদপসরণের ভালো রাস্তা (withdrawal route) থাকে। সুবেদার ওহাব এখানে অত্যন্ত উঁচু মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন যা দলের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিনায়কের দৃঢ় মনোবল এ সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

যদিও সামরিক প্রশিক্ষণে এটা শিক্ষা দেয়া হয় যে এম্বুশের সময় বিভিন্ন দল নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে শত্রুর জন্য প্রতিক্ষা করবে, কিন্তু সুবেদার ওহাব তার দলের প্রশিক্ষণ ও মনোবল যাচাই করে শত্রু দেখার আগ পর্যন্ত তার দলকে একত্রিত রেখেছিলেন। এটা প্রচলিত শিক্ষার ব্যতিক্রম হলেও দলের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যার ফলে সৈনিকরা সম্ভবত গুলিবর্ষণ করে ও সংঘবদ্ধভাবে পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবুও লক্ষণীয় বিষয় যে কভারিং ফায়ার দেয়ার জন্য যাকে একাকী এবং একটু দূরে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যে তার এলএমজি ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য দলকে আগে থেকে একাকী দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলে হয়তো তারাও মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে এমনি করে পালিয়ে যেত এবং গোটা এম্বুশ শুরু করার আগেই শেষ হয়ে যেত। একজন সামরিক দলের অধিনায়ককে তার সৈনিকদের এই ধরণের আচরণ (যা যুদ্ধের ময়দানে হওয়া স্বাভাবিক) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

যে সমস্ত শত্রু উঁচু রাস্তার অপর পাড়ে আড় নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে মর্টার ও গ্রেনেডের ব্যবহার বিশেষ কার্যকর হত যা তারা করেননি।

সকলকে পশ্চাদপসরণের পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে করে অভিযানের পর ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় এবং কেউ যেন হারিয়ে না যায়।

কোনো অবস্থাতেই সৈনিকরা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে না। দুর্বলচিত্তের অধিকারী সৈনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও যুদ্ধের ময়দানে ঘাবড়িয়ে গিয়ে তাদের পক্ষে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সে জন্যই প্রশিক্ষণ বাস্তবধর্মী (Realistic) এবং জীবন্ত (live) মহড়ার মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে করে সৈনিকরা যুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝে দৃঢ় মনোবল ও স্থিরচিত্তের পরিচয় দিতে পারে।

## মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ট্রলি ধ্বংস অভিযান

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানগুলোর মধ্যে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে পাক সেনাদের গোলাবারুদ ও রসদবহনকারী একটি রেলওয়ে ট্রলি ধ্বংস অভিযান অন্যতম। ১৮ইই জুনে পরিচালিত এই অভিযানে উক্ত রেলওয়ে ট্রলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি ছিল একটি ত্বরিৎ এম্বুশ। এই অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শত্রুর সংবাদ লাভের পর কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই অত্যন্ত অল্প সময় (২/৩ ঘণ্টা) এর মধ্যে এম্বুশ পেতে সাফল্যজনকভাবে ট্রলির ধ্বংস কাজ সম্পন্ন করা।

মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ এবং আক্রমণ তীব্রতর আকার ধারণ করার আগে যখন পাকবাহিনী আখাউড়া কুমিল্লা রেলওয়ে লাইন যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে তখন বিএসএফ এর মারফত সংবাদ পাওয়া যায় যে পাকসেনারা একটি রেলওয়ে ট্রলিতে গোলাবারুদ ও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে কসবা থেকে শালদা নদী এলাকায় অবস্থিত প্রতিরক্ষা ব্যূহতে নেয়ার জন্য যাচ্ছে। এই সময় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭ নম্বর প্লাটুন কসবার ৫ মাইল পূর্বে দেবীপুরে অবস্থান করছিল। শত্রু ও ট্রলির ওপর এম্বুশ করার জন্য ৭ নম্বর প্লাটুনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বেলা তখন আনুমানিক সাড়ে এগারোটা (চিত্র দেখুন)।

যখন এই সংবাদ পাওয়া যায় তখন লক্ষবস্তু ও গন্তব্যস্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে অথচ শালদা নদী পৌঁছানোর আগেই তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। কাজেই হাতে সময় অল্প। সুবেদার ওহাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক ৪০ জনের একটি দল প্রস্তুত করেন এবং মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুকে এম্বুশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর দল নিয়ে অনেকটা দৌড়ে ও তাড়াহুড়ো করে মন্দভাগ ষ্টেশনের পূর্বদিকে রেললাইন থেকে মাত্র দেড়শ গজ দূরে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার সাথে ছিল ২টি মেশিনগান, ৭টি এলএমজি, ১টি ২´´ মর্টার এবং ১টি ব্লেন্ডিসাইড। সুবেদার ওহাব তার দলকে গ্রাম ও গাছপালার আড়ালে এমনভাবে লাগান যে একেবারে কাছে থেকেও তাদের অবস্থান দেখে ফেলার সম্ভাবনা ছিল না। বলাবাহুল্য তাদের পোশাকও ছিল স্থানীয় জনসাধারণের মত। যখন তার দল অবস্থান গ্রহণ করে তখন শত্রুর রেলওয়ে ট্রলি মন্দভাগ স্টেশনের উত্তরে সিগন্যাল পোস্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এ সময় বেলা আনুমানিক আড়াইটা। রেলওয়ে ট্রলিকে মাঝখানে রেখে রেললাইনের দু'পাশ দিয়ে পাকসেনারা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রেল লাইন ছাড়াও পশ্চিম দিকের কসবা-শালদা নদী বোর্ডের রাস্তা ধরেও বেশ কিছু পাকসেনা এগিয়ে আসছিল।

রেলওয়ে ট্রলি যখন এম্বুশ এলাকায় প্রবেশ করে তখন সুবেদার ওহাবের ফায়ারের সাথে সাথে তার দল লক্ষবস্তুর ওপর আঘাত হানে। আচমকা এই আক্রমণে রেলওয়ে ট্রলি দাঁড়িয়ে যায় এবং অধিকাংশ পাকসেনা যদিও হকচকিয়ে যায় কিন্তু পরমুহূর্তে উঁচু রেললাইনের পশ্চিম দিকে আড় গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনীর গুলিবর্ষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং পাল্টা গুলিবর্ষণ করে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সুবেদার ওহাব সিপাই হেফজু মিয়া ও অপর একজনকে ট্রলিটি টেনে স্টেশনের দিকে নেয়ার জন্য আদেশ দেন। তারা ক্রলিং করে ট্রলির কাছে গিয়ে রেল লাইনের অপর পাশে দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কিন্তু ওপাশ পর্যন্ত না পৌছানোয় বিস্ফোরিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো শত্রুর তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। যখন ট্রলিটিকে টেনে আনার চেষ্টা করছিল তখন সিপাহী বসু মিয়ার ফায়ারে হঠাৎ করে ট্রলির অভ্যন্তরের গোলাবারুদ-এ আগুন ধরে সেগুলো সশব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে এবং ট্রলিতে আগুন ধরে যায়। গোলাবারুদের কিছু বাক্স ট্রলি থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সুবেদার ওহাব তৎক্ষণাৎ তাদেরকে ট্রলির কাছ থেকে সরে আসতে বলেন। মুক্তিবাহিনী ছিটকে পড়া বেশ কিছু গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। পরে সুবেদার ওহাব তার দল নিয়ে সেখান থেকে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দলের সাথে যারা এম্বুশে অংশ নেয় তাদের কয়েকজনের নাম : নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া, হাবিলদার মোসলেম, নায়েক তোফাজ্জেল হোসেন পাটোয়ারী, সিপাহী হেফজু মিয়া, সিপাহী কালাম এবং নায়েক সোবহান।

এই অভিযানের পরদিন সকালে সুবেদার ওহাব আবার উক্ত স্থানে গিয়ে ট্রলিটি জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি স্থানীয় লোকের সাহায্যে ট্রলি থেকে কিছু সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সেখান থেকে প্রচুর আটা ও চাল গ্রামবাসীদের ভিতর বিতরণ করা হয়। ট্যাংক বিধ্বংসী রাইফেল, মর্টার ইত্যাদি অস্ত্রের গোলাবারুদ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং অনেক টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই অভিযানের ফলে কসবা ও শালদানদী সংযোগকারী রেলওয়ে লাইন শত্রুর ব্যবহারের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এই অভিযানে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য পাকসেনাদের এত বেশি ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা পরবর্তী কয়েকদিন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐ এলাকায় নির্বিচারে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে। জনাব আবদুল মালেক (হেডমাস্টার, বায়েক হাই স্কুল) এর বক্তব্য অনুযায়ী ট্রলি ধ্বংস হওয়ার পর পর পাকসেনাবাহিনী কেবলমাত্র বায়েক গ্রামের ৪৭ জন লোক হত্যা করে। এদের মধ্যে ঐ গ্রামের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ তমিজ উদ্দিন সর্দারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

মোঃ কেরামত আলী, পিতা মৃত মনসুর আলী, বায়েক, কসবা, রেলওয়ে ট্রলির ওপর আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছেন। আবুল হাসেম, পিতা মিন্নত আলী, কলতা দিঘীর পাড়, আবুল করিম, পিতা— আসমত আলী, বায়েক, কসবা, আবদুল সোবহান, পিতা— দিল্লর আলী, বায়েক, কসবা, মোহাম্মদ আলী, পিতা— আসমত আলী, বায়েক, কসবা, এরা এবং মন্দভাগ রেল স্টেশনের সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা সুবেদার ওহাবের

নেতৃত্বে পরিচালিত ট্রলি ধ্বংস অভিযানসহ ঐ এলাকায় পরিচালিত অন্যান্য অভিযান সম্বন্ধে অবগত। তারা সকলেই পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সুবেদার ওহাব ও তার সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানগুলোর কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লেখ করেন।

এ ছিল অত্যন্ত তাড়াহুড়ায় করা এম্বুশ যা সহজ পরিকল্পনায় ও অল্প প্রস্তুতিতে কার্যকর করা হয়েছিল। এম্বুশ দলের অত্যন্ত ত্বরিৎ গমনাগমন এবং শত্রুর রেলওয়ে ট্রলি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর দ্রুত অবস্থান নিয়ে বাড়তি সময় লাভ করে লক্ষবস্তুকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের এম্বুশের মধ্যে পাওয়া। যুদ্ধের ময়দানে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই প্রত্যেক সেনানায়কের জন্য হয় অগ্নিপরীক্ষা এবং যিনি ঐ পরীক্ষায় সফল হন তিনিই যুদ্ধের গতিকে নিজের আয়ত্বে আনতে সক্ষম হন। ওহাবের কৃতিত্ব সেখানেই।

শত্রুকে সঠিক সময়ে গুলিবর্ষণ করে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার মাধ্যমে সারপ্রাইজ অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। অধিক সংখ্যক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কার্যকরী গোলাবর্ষণ দ্বারা শত্রুর জনশক্তির প্রাধান্য বিশেষভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে কো-অর্ডিনেটেড বা সমন্বিত ফায়ার দিয়ে নিজস্ব জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতাও পুষিয়ে নেয়া যায়।

এম্বুশ দল বেসামরিক পোশাক পরিধান করার ফলে এবং এলাকা ও প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়াতে দিবালোকেও তারা শত্রুর নজর এড়াতে সক্ষম হয়। এম্বুশ করার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন যেখান থেকে সহজে আড়াল নিয়ে লুকিয়ে থেকে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়।

যে সমস্ত শত্রু উঁচু রেল সড়ক বা রাস্তার অপর পার্শ্বে আড়াল নিয়েছিল তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য মাথার ওপর দিয়ে গুলিবর্ষণ (High Trajectory Weapon) করা সম্ভব। এ রকম অস্ত্র যেমন মর্টার, গ্রেনেড ফায়ারিং রাইফেল ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল বা সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তারা করেননি বা সাথে নেননি।

শত্রুর দিক থেকে বলা যায় যে তারা যদি হতবুদ্ধি না হয়ে এম্বুশকারী দলের ওপর সরাসরি চার্জ করে বের হয়ে যেত তবে সেটাই হত বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা এই ধরণের এম্বুশে সেটাই করা বেশি প্রয়োজন। এতে তাদের হয়তো কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হত কিন্তু তারা এম্বুশকারীদের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে পারতো। এমনকি সমস্ত দলকে উল্টো ধ্বংস করে দিতে পারত। কারণ শত্রু যেভাবে ট্রলিটিকে দুইধার দিয়ে এসকর্ট করে আসছিল সেইভাবে তারা যদি এম্বুশকারীদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাত তবে এম্বুশদলের পক্ষে উইথড্র করা খুব কঠিন হত।

## ঝিকুরা অভিযান

এটি সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি উল্লেখযোগ্য এম্বুশ। জুলাই মাসের ১০ তারিখে কসবা থানাধীন ঝিকুরা গ্রামের কাছে এই অভিযান চালান হয়। এই অভিযানে প্রায় ১২ জন আরোহীসহ (এর মধ্যে সম্ভবত ৮ জন অফিসার) পাকবাহিনীর ১টি স্পিড বোট সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। সহজ পরিকল্পনা, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং উদ্দেশ্য

কার্যকর করার মনোবল থাকলে দিনের বেলাতেও যে এম্বুশ করে শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব এটা তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

মে-জুন মাসে পাকসেনারা কসবা থানার শালদানদী, মন্দভাগ বাজার, কামালপুর ইত্যাদি এলাকায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। এসব এলাকায় যোগাযোগের জন্য কুমিল্লা থেকে সিএন্ডবি সড়কযোগে তারা কালামুড়িয়া ব্রিজ পর্যন্ত আসার পর সেখান থেকে উল্লিখিত স্থানসমূহে রসদ, গোলাবারুদ ও সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য নদীপথ ব্যবহার করতো।

শালদানদী দিয়ে শত্রুর চলাচল সম্বন্ধে সুবেদার ওহাব অবগত ছিলেন। কোনাবনে অবস্থানরত তার প্লাটুন নিয়ে এই পথে শত্রুর উপর এম্বুশ করার জন্য তিনি কোম্পানি অধিনায়কের অনুমতি গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী তিনি ৩০/৩৫ জনের একটি দল প্রস্তুত করেন যার সহ-অধিনায়ক ছিলেন নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া। ভারি অস্ত্রের মধ্যে ছিল ১টি মেশিনগান, ৭/৮টি লাইট মেশিনগান।

অভিযানের দিন অতি প্রত্যুষে সুবেদার ওহাব তার প্লাটুন নিয়ে কোনাবন শিবির ত্যাগ করেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করে কালতাদিঘীর পাড় ও নাপতার হাট হয়ে সকাল নয়টায় তিনি মইনপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পান যে ১টি স্পিড বোট ও ৬/৭টি নৌকায় প্রায় ১০০ জন পাকসেনা নদীর উভয় তীরে পায়ে হাঁটা প্রহরাদলসহ শালদা নদী দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুবেদার ওহাব অনুমান করেন যে শত্রু ঐ দিনই একই পথে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তখনই তাকে আঘাত হানার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার দলকে মইনপুর গ্রামে রেখে শত্রু চলে যাওয়ার পর সুবেদার ওহাব একা নদীর পাড়ে গিয়ে এম্বুশের স্থান নির্বাচন করেন।

উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনী প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকায় তাঁর দলের ওপর শত্রুর পাল্টা আক্রমণের আশংকা করে সুবেদার ওহাব, মইনপুর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত কামালপুর গ্রাম থেকে প্রায় এক হাজার গজ আগে বিনি নদীর পশ্চিম পাড়ে খালের ওপর ব্রিজে ১টি মেশিনগান (হাবিলদার মুসলিমের দায়িত্বে) মইনপুর গ্রামের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত এবং মইনপুর গ্রামের উত্তর পশ্চিমে গোবিন্দপুরের দিকে মুখ করে আরো ১টি লাইট মেশিনগান মোতায়েন করেন।

এম্বুশের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের পর বেলা ১২টার দিকে প্লাটুনকে নির্ধারিত স্থানে মোতায়েন করা হয় (চিত্র দেখুন)। সুবেদার ওহাব ১টি এলএমজি সহ ৫/৬ জনকে নিয়ে নদীর পূর্ব পাড়ে একটি বটগাছের পাশে অবস্থান নেন। নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া ৩/৪টি এলএমজি ও ৬ জনকে নিয়ে নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থান নেন। অপর একটি দলকে এলএমজিসহ বটগাছের ঠিক উত্তরে ২০/৩০ গজের মধ্যেই মোতায়েন করা হয়। সিপাহী সামসু ও তার সাথে আর একজনকে বটগাছের দক্ষিণে নদীর বাঁকে রাখা হয় পূর্ব সংকেত দেয়া এবং প্রয়োজনবোধে শত্রুকে গুলি করার জন্য। ঐ এলাকায় পানির ওপর বেড়ে ওঠা ৪/৫ হাত লম্বা ধান ও ছন জাতীয় গাছ থাকায় তারা দিনের বেলায় শত্রুর দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

দুপুর ২টার দিকে শত্রুর স্পিড বোটটিকে দলের অন্যদের থেকে অনেক আগে বেশ দ্রুত ফিরে আসতে দেখা যায়। যখন এম্বুশ দলের আওতার মধ্যে পৌঁছে যায় তখন সুবেদার ওহাব তার এলএমজি দিয়ে স্পিড বোটের ওপর গুলি শুরু করেন এবং পরিকল্পনা মাফিক দলের অন্যান্য সদস্যরা স্পিড বোটের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সময় স্পিড বোট থেকে সুবেদার ওহাবের দূরত্ব ছিল মাত্র ২৫/৩০ গজ। আচমকা এই গুলিবর্ষণে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শত্রু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই তারা পায়নি। এত কাছে থেকে ফায়ার করার ফলে স্পিড বোটটি ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং এর ফলে সকল আরোহী নিহত হয়।

সুবেধার ওহাবের মতে স্পিড বোট এর আরোহীদের মধ্যে সম্ভবতঃ ছিল পাকবাহিনীর ২ জন কর্নেল, ২ জন মেজর, ৪ জন ক্যাপ্টেন (এদের মধ্যে ১ জন ছিল বাঙালি মেডিক্যাল অফিসার) এবং ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট এর সুবেদার মেজর। দু'জন কর্নেলের মধ্যে ১ জন ছিল ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাজহারুল কাইয়ুম। এই দলে নিহতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কুখ্যাত ক্যাপ্টেন বোখারী যার অত্যাচারে কুমিল্লা শহরে ত্রাস ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযানকারী দল স্পিড বোট থেকে ১টি এমজি১এ৩ (MGIA3), ১টি এসএমজি, গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল ম্যাপ এবং বেতারযন্ত্র উদ্ধার করে।

আবদুল জলিল, পিতা— আবদুল গফুর, মইনপুর, কসবা, তিনি তার নৌকায় করে নায়েব সুবেদার মংগল মিয়ার দলকে নদীর ওপারে যেতে সাহায্য করেন এবং দূর থেকে স্পিড বোটের ওপর এ্যাম্বুশ প্রত্যক্ষ করেন।

৭ নম্বর প্লাটুন কর্তৃক সম্পাদিত এ্যাম্বুশ সমূহের মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে সফল অভিযান। এতে আনুমানিক ১২ জন নিহত হয় যার মধ্যে ৮ জনই অফিসার ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই অভিযানে প্রমাণিত হয় যে দিনের এম্বুশও সফল হতে পারে যদি তার পরিকল্পনা সহজ হয় ও দলের সদস্যবৃন্দ লক্ষ অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। এর বিশেষ দিকসমূহ ছিল

পূর্বাহ্নে রেকি করে স্থানটি অতি সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা হয়েছিল।

এম্বুশটি এমন জায়গায় কার্যকর করা হয়েছিল যেখানে শত্রুর যাতায়াত ছিল এবং কাছাকাছি বেশ কিছু শত্রু অধ্যুষিত এলাকা থাকলেও এম্বুশ দলকে নিরাপদ রাখার জন্যে কমান্ডার সঠিকভাবে তিনটি স্থানে বহিরাগত শত্রুদের দলের ওপর নজর রাখা বা বাধা প্রদানের জন্য নিরাপত্তা প্রহরী দল নিয়োগ করেন।

শালদা নদীর অপর পাড়ে নায়েব সুবেদার মংগল মিয়ার অধীনে একটি অবস্থান ছিল যেটা পরিহার করা যেত। যদি এম্বুশটি অসফল হত তবে উক্ত স্থান থেকে আসা এবং প্রধান দলের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হত না। অধিকন্তু স্পিড বোটটি আগের মত নদীর উভয় তীর দিয়ে টহল দল কর্তৃক অনুসরণ করা হয়নি। এম্বুশ কমান্ডার স্বীকার করেছেন যে স্পিড বোটটি যদি প্রহরীসহ আসত তবে তার দলের অধিকাংশই হতাহত হত।

যদিও তার দলের অনেকেই কমান্ডারকে উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছিল তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে অভিযান কার্যকর করতে অবিচল ছিলেন যা অধিনায়কোচিত গুণ।

লক্ষবস্তু আবির্ভূত হলে এম্বুশ দল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বল্পতম দূরত্ব থেকে অধিক সংখ্যক অস্ত্র দ্বারা কার্যকর ফায়ার শুরু করেছিল। প্রচলিত প্রশিক্ষণে লক্ষবস্তুর উপর ঘনীভূত ফায়ার (Concentrate Fire) এবং মৃত্যু এলাকা (Killing Zone)-এর অভ্যন্তরে আসলে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করার যে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে সুবেদার ওহাবের দলই এই অভিযানে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

শত্রুর দিক থেকে বলা যায় যে এই ধরণের অভিযানে ব্যাপৃত যে কোনো সেনাবাহিনী নদী পথে চলাচলের সময় যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা (যেমন এস্কর্ট, পিকেটিং, ইত্যাদি) গ্রহণ না করে তবে সেটা তাদের জন্য বিপজ্জনক। যুদ্ধের সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শত্রু ফেরার পথে তা যথাযথভাবে মেনে চলেনি যার মূল্য তাকে দিতে হয়েছে চরমভাবে। শত্রুর বেপরোয়াপনা আর সুবেদার ওহাবের এম্বুশের স্থান ও অস্ত্র এর স্থান নির্বাচনে পারদর্শিতা ও দৃঢ় মনোবলই এম্বুশকে সাংঘাতিকভাবে সফল করেছে।

## মিরপুর-মাধবপুর অভিযান

জুলাই মাসের প্রথমদিকে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়কের ওপর কালামুড়িয়া ব্রিজে প্রহরারত অনুগত রাজাকারদের (হাবিলদার বুরহানউল্লাহ) সহযোগিতায় এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার আম্বিয়ার নেতৃত্বে কালামুড়িয়া ব্রিজটি রাতের অন্ধকারে ধ্বংস করে দেয়া হয়। একই রাতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সি কোম্পানি শালদানদীতে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষার উপর গুলিবর্ষণ করে।

সেদিনই রাতে সুবেদার ওহাব সঠিকভাবে অনুধাবন করেন যে কালামুড়িয়া ব্রিজ পরিদর্শনে কুমিল্লা থেকে সিএন্ডবি সড়ক দিয়ে অবশ্যই পাক বাহিনীর অফিসাররা যাবে। এই সুযোগে উক্ত সড়কে এম্বুশ করার জন্য অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গাফফারের কাছে অনুমতি গ্রহণ করেন যদিও তাকে জানানো হয় যে সুবেদার সামসুর মর্টারের গোলাবর্ষণ সহযোগিতা তিনি লাভ করবেন না (সুবেদার সামসু তখন মর্টার প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন)।

আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি দল নিয়ে সুবেদার ওহাব শালদানদী এলাকা থেকে চাড়রা, ঝিকুরা ও শাইটলা হয়ে নৌকাযোগে সকাল ৯টার দিকে মাধবপুর গ্রামে পৌঁছান। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় লোক মারফত জানতে পারেন যে পাকবাহিনীর একটি পতাকাবহনকারী জিপসহ মোট তিনটি গাড়ি ইতোমধ্যেই কুমিল্লার দিক থেকে কালামুড়িয়া ব্রিজের দিকে গেছে।

উপরোক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর সুবেদার ওহাব তার দলকে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং করেন এবং তার নির্দেশ মতো তারা মীরপুর-মাধবপুর এলাকায় সিএন্ডবি সড়কের পূর্ব পাশে অবস্থান

গ্রহণ করে (চিত্র দেখুন)। অধিনায়ক নিজে রাস্তার কাছাকাছি একটি ঘরের পাশে এলএমজি সহ তার উত্তরে পুকুরের পাড়ে এবং সর্ব দক্ষিণে নায়েক তাহের আর একটি পুকুরের ধারে গাছপালার ঝারিতে এলএমজিসহ অন্যান্য সৈনিকদের নিয়ে অবস্থান নেয়।

এই সময় উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে ৩ জন রাইফেলধারী রাজাকারকে এম্বুশ দলের অধিনায়কের অবস্থান থেকে প্রায় ৪০০ গজ দক্ষিণে রাস্তার ওপর ব্রিজের (২ নম্বর ব্রিজ) নিচে প্রহরারত তাদের অন্যান্য সঙ্গীদেরসহ অগ্রসর হতে দেখা যায়। সুবেদার ওহাবের নির্দেশে নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া অতি সন্তর্পণে এগিয়ে তাদের মধ্যে বাচ্চু নামে একজনকে (যার কাছে রাইফেল ছিল) পেছন দিক থেকে জাপটে ধরে ফেলেন তখন অন্য দু'জন "মুক্তি আগিয়া" বলে চিৎকার করে ওঠে। বাকি দু'জনকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আদেশ দেয়া হলে তারা তাদের হাতিয়ার নিয়ে আসার কথা বলে উক্ত ব্রিজের দিকে (যেখানে তাদের প্রহরী ছিল) অগ্রসর হয়।

এম্বুশ দল উত্তর দিক থেকে শত্রুর আগমনের জন্য প্রতিক্ষা করছিল; কিন্তু উক্ত রাজাকারদ্বয় ব্রিজের কাছাকাছি পৌছাতেই দক্ষিণ দিক কুমিল্লার দিক থেকে একটি জানালা বন্ধ বাস সেখানে ব্রিজের কাছে পৌছলে তারা সেটা থামায়। দূর থেকে সুবেদার ওহাব রাজাকারদ্বয়কে বাসে আরোহীরা মিলিটারি কিনা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দেয় আরোহীরা সিভিল। এর কিছুক্ষণ পরেই ১টি ডজসহ আরো দু'টি গাড়ি দক্ষিণদিক থেকে বাসের পেছনে এসে থামে। এম্বুশ দলের সর্ব দক্ষিণে অবস্থানকারী নায়েক তাহের এই গাড়িদ্বয়ের আরোহদের মিলিটারি বলে চিনতে পারে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার ওহাবকে জিজ্ঞেস করে তাদের উপর ফায়ার করবে কিনা। সুবেদার ওহাব তৎক্ষণাৎ তাকে ফায়ার করার আদেশ দেন এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী সকলেই একযোগে বাসে ও ডজের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে।

একই সময় গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে হঠাৎ সুবেদার ওহাব দেখেন যে পতাকাবাহী ১টি জিপ কালামুড়িয়া ব্রিজের দিক থেকে অতি দ্রুতবেগে ১ নম্বর ব্রিজটি অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। দেখা মাত্রই তিনি এলএমজি দ্বারা জিপের ওপর গুলিবর্ষণ করার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু প্রথমত সেফটি ক্যাচ অন না থাকায় এবং লিড নিতে ভুল করায় এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনি জিপে আঘাত করতে ব্যর্থ হন। ফলে সম্ভবত ব্রিগেড কমান্ডারের জিপ আশ্চর্যজনকভাবে খুব দ্রুতগতিতে এম্বুশ এলাকা অতিক্রম করে চলে যেতে সক্ষম হয়। তবে তার সামান্য পেছনেই আগমনকারী ১টি ডজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হন এবং কয়েকজন পাকসেনা রাস্তার পাড়ে আশ্রয় নেয় এবং অন্যান্যরা হতাহত হয়।

গুলিবর্ষণ বন্ধ করার পর নায়েব সুবেদার মংগল মিয়াকে রাস্তার কাছে পাঠানো হয় যারা বেঁচে আছে তাদের আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া তার পাশের জওয়ানকে সাথে আসার অনুরোধ করে কিন্তু জওয়ান চেম্বারে গুলি ভরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার পাশে অবস্থিত এফএফ (ছাত্র) মোজাম্মেল হক তার সাথী হন। তিনি রাস্তার কাছে পৌছিয়ে চিৎকার করে শত্রুদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। তখন

পাকসেনাদের ইএমই কোরের ১ জন নায়েক হাত তোলার ভান করে রাস্তার উপর উঠে এসে আচমকা নায়েব সুবেদার মংগল মিয়াকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ে। তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে মংগল মিয়া সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পান। আবার আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেয়া হলে একজন নায়েক (পাঠান) আত্মসমর্পণ করে। তারপর আরো একজন আসে। তখন নিরুপায় হয়ে প্রথমোক্ত ইএমই কোরের নায়েক, নায়েব সুবেদার মংগল মিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করে। তাদের হাতিয়ার সংগ্রহ করা হয়।

সুবেদার ওহাবের বক্তব্য অনুযায়ী এই অভিযানে বেশ কিছু সংখ্যক পাকসেনা হতাহত হয় এবং কয়েকটি গাড়ি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিগেড কমান্ডারের জিপের পেছনে আগমনকারী সিভিল গাড়িটি ধ্বংস অবস্থায় অনেকদিন পর্যন্ত সেই স্থানে পড়েছিল বলে স্থানীয় লোকজনের কাছে জানা যায়। একজন রাজাকার সহ ৪ জন শত্রুসেনা হাতেনাতে বন্দি করে নায়েব সুবেদার মংগল মিয়া এই অভিযানে সাহসিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মাধবপুর গ্রামের পূর্বদিকে রাখা নৌকায় উঠে দেখা যায় সিপাহী দারুল আলম সেখানে পৌঁছায়নি। সুবেদার ওহাব আবার পূর্বস্থানে ফিরে এসে সিপাহী দারুলকে খোঁজ করেন। সে দক্ষিণ পূর্ব দিকের পুকুরের পাড় থেকে তখনও দক্ষিণ দিকের গাড়িগুলোর উপর ফায়ার করছিল। তাকে নিয়ে প্লাটুন একই পথে কোনাবন ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪ জন বন্দিকে সাথে করে কোনাবনে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে কোম্পানি সদরে হস্তান্তর করা হয়। বন্দি করার সময় দু'একটি চড় থাপ্পড় দেয়া ছাড়া পথে তাদের সাথে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয়নি বলে সুবেদার ওহাব উল্লেখ করেন।

## দেউশ- মন্দভাগ অভিযান

এ সময় বর্ষাকাল থাকায় চারদিক পানিতে নিমজ্জিত ছিল। ফলে শালদানদীর সাথে যোগাযোগ রক্ষায় পাকবাহিনীকে কুটি থেকে শালদানদী পথ অথবা চান্দলা খাল ব্যবহার করতে হত। এই সকল পথে প্রায় রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম বহনকারী নৌকায় পাকসেনারা শালদানদীতে যাতায়াত করতো। ৭ নম্বর প্লাটুনের দায়িত্ব ছিল মন্দভাগ বাজার হয়ে শালদানদী যাতায়াতকারী শত্রুর যে কোনো দলকে প্রতিহত করা।

ঐ দিন চান্দলা খাল দিয়ে ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্টের ১টি কোম্পানি রাতের অন্ধকারে শালদানদী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

সুবেদার ওহাবের প্রতিরক্ষা ছিল  এমজি (ক) চান্দলা খালের দক্ষিণ পাড়ে আবু মিয়ার বাড়ির পাশে। (খ) দ্বিতীয় এমজির অবস্থান সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এলএমজি-গুলো ছিল (ক) মসজিদের পাশে (খ) ২ নম্বর পুকুরের নিকট। (গ) ১ নম্বর পুকুরের পাড়ে। (ঘ) স্কুলের পাশে। (ঙ) খালের দক্ষিণ পাড়ে। (চিত্র দেখুন)

ভোর ৪টার দিকে শত্রুর অগ্রসরমান নৌবহনের শব্দ চান্দলা খালে মাছ ধরায় নিয়োজিত জনৈক আবু মিয়া শুনতে পায়। তার সন্দেহ হওয়াতে সে তার বাড়ির

নিকটবর্তী মেশিনগান পোস্টে খবর দেয়। কিন্তু উক্ত এমজি পোস্টে কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়ার পূর্বেই প্রথম নৌকা প্রতিরক্ষা অবস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঠিক এ সময় মসজিদের পাশের এলএমজি পোস্টের নায়েক আতাউর রহমান (১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) নৌকাকে থামার আদেশ দেয়। তখন শত্রু সেখানে মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পায় এবং নায়েক আতাউর রহমানকে নৌকা থেকে উর্দুতে গালিগালাজ করে। এতে নায়েক আতাউর পাকসেনাদলের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এলএমজি দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে সমগ্র প্রতিরক্ষা সচকিত হয়ে উঠে এবং নৌকার উপর গুলিবর্ষণ করে।

এ সময় সুবেদার ওহাব তার প্লাটুন নিয়ে সদর দফতর মন্দভাগ বাজারে অবস্থান করছিলেন। তিনি সম্মুখে এসে ফায়ার যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং প্রথমে মসজিদের এলএমজি পোস্ট ও পরে আবু মিয়ার ঘরের পশ্চিমে দিকের এমজি পোস্ট থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। শত্রুর ৭/৮টি নৌকা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উক্ত পাকসেনা দলের অধিকাংশই নিহত অথবা আহত হয়।

সূর্য ওঠার পর সকালে সুবেদার ওহাব তার দলের কিছু সদস্য নিয়ে নৌকা এবং খাল থেকে ১৫/২০টি লাশ উদ্ধার এবং স্থানীয় দু'একজন লোকের সহায়তায় (দেউশ গ্রামের মহব্বত আলী পাকসেনাদের লাশ দেখেছে এবং ১২টি লাশ কোনাবন পর্যন্ত বহন করেছে বলে জানায়) বেশ কিছু লাশ কোনাবন কোম্পানি সদরে পাঠানো হয়।

ভোর রাতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সকাল দশটার দিকে বেশ কিছু সংখ্যক পাকসেনা সংগঠিত হয়ে এবং নতুন শক্তি নিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এ সময় সুবেদার ওহাব এমজি পোস্ট এবং দলের অন্যান্য সদস্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করলে অনেকেই নিহত এবং আহত হয়। কিলিং জোনে মুক্তিবাহিনীর সমন্বিত গুলিবর্ষণের ফলে পাক সেনাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং তারা অগ্রসর হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে। কিন্তু সম্মুখ সমরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করার পর দুপুর প্রায় একটার দিকে শত্রু দেউশ প্রতিরক্ষার উপর প্রচণ্ড বিমান হামলা শুরু করে। বিমান আক্রমণে ৪টি বিমান অংশ নিয়ে পর্যায়ক্রমে দুদিক থেকে গুলিবর্ষণ করে। সৌভাগ্যক্রমে সুবেদার ওহাবের প্লাটুন বিস্তৃত হয়ে নিকটস্থ গ্রাম ও গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নেওয়ায় কেউ হতাহত হয়নি। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে নয়নপুর গ্রামের শাহ এমরান গাজীও একই মত প্রকাশ করেন।

বিমান হামলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুবেদার ওহাব তার অপারেটর হাবিলদার মোসলেমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে হামলা চলাকালীন এবং তার পরে প্রায় ১ ঘণ্টা কোম্পানি দফতরে যোগাযোগ করতে সক্ষম হননি। এদিকে কোনো যোগাযোগ না হওয়াতে কোনাবনে অবস্থিত ক্যাম্পের সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং নায়েব সুবেদার শহীদকে ৩/৪ জনসহ সংবাদ জানার জন্য পাঠানো হয়। নায়েব সুবেদার শহীদ দেউশে পৌঁছে সুবেদার ওহাবের দলকে নিরাপদ অবস্থায় দেখতে পান এবং কোম্পানি সদরে সংবাদ জানানো হয়।

সিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া, পিতা— মৃত আসমত আলী, দেউশ, কসবা এবং আবদুল গফুর, দেউশ, কসবা। এরা দুজন ভোর রাতে পাকসেনাদের উপর গুলিবর্ষণের পর মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই অভিযানে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে রাতের অন্ধকারে অপ্রস্তুত অবস্থায় ঢুকে পড়া শত্রুকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে :

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসমূহ মোটামুটি আদর্শ স্থানে স্থাপনের ফলে একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র স্থাপনের নীতিসমূহ যুদ্ধের সময় মেনে চলার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণে সবসময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেউশ-মন্দভাগ বাজার অভিযানে দেখা যায় যে সব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ফিল্ড অব ফায়ার, পারস্পরিক সহযোগিতা, কনসিলমেন্ট ইত্যাদি থাকার ফলে উক্ত প্লাটুন তাদের অবস্থান থেকে শক্তিশালী ও অত্যন্ত কার্যকরী গুনির জাল সৃষ্টি করেছিল যা ভেদ করা শত্রুর পক্ষে কোনো ক্রমেই সম্ভব হয়নি বরং তাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

প্রতিরক্ষা অবস্থানে শত্রুর আগমন সম্বন্ধে জানার জন্য (Continuous Alertness) অবিরাম সতর্কতা অবলম্বনে এবং কোনো কিছু দেখা কিংবা শোনার জন্য সজাগ সৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই অভিযানে দেখা গেছে যে, খালের প্রথম এমজি পোস্ট অতিক্রম করে অনেক ভিতবে এলএমজি পোস্টের নিকট শত্রুর নৌকা পৌঁছার পরই কেবল তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। শত্রু গালিগালাজ না করে সক্রিয় হলে প্রতিরক্ষাব্যুহের প্রভূত ক্ষতি করতে পারতো।

প্রথমদিকে সমস্ত প্লাটুন একযোগে ফায়ার শুরু করে। সুবেদার ওহাব সামনে এসে ফায়ার নিয়ন্ত্রণে আনেন। অনিয়ন্ত্রিত ফায়ার শুধু গুলির অপচয়ই করে না, কোনো কার্যকর ফলও আনতে পারে না। অন্যদিকে শত্রু সহজেই অস্ত্রের অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে প্রতিরক্ষাব্যূহের দুর্বল স্থানে আক্রমণ এবং অস্ত্রসমূহের মর্চার পর সরাসরি গুলিবর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যে কোনো অভিযানে ফায়ার কন্ট্রোল অত্যাবশ্যক।

বিমান হামলার সময় সুবেদার ওহাবের প্লাটুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নেয়ার ফলে তাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। বিমান হামলা শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুবেদার ওহাবের সিগন্যাল অপারেটর তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয়নি। তাই বেতারযন্ত্র ছাড়াও যোগাযোগের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সংবাদ বাহক থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শত্রু কোনো প্রকার রেকি ছাড়াই নৌকাযোগে চলাচল করেছিল। তার ভুলের মাসুল তাকে দিতে হয়েছে চরমভাবে। সর্বদাই রেকি পেট্রোল পাঠিয়ে এলাকা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা প্রত্যেক কমান্ডারের আশু কর্তব্য তা না হলে প্ল্যান যত উন্নতমানের হউক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রশিক্ষণকালে যুদ্ধের কলাকৌশল পুস্তক অনুযায়ী অবশ্যই দেখা উচিত। কলাকৌশলগুলো বিশেষভাবে রপ্ত করতে পারলেই যুদ্ধের ময়দানে পরিস্থিতি মোতাবেক নিজেদের অবস্থান, দল বিন্যাস, সংগঠন ইত্যাদি রদবদল করা সম্ভব। প্রায় সব ক্ষেত্রেই

সুবেদার ওহাব পরিস্থিতি ও নিজ সৈনিকদের প্রশিক্ষণের মান অনুযায়ী দলের বিন্যাস, সংগঠন ও অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সর্বোপরি অধিনায়কোচিত আচরণ তিনি সকল অভিযানে দেখিয়েছিলেন। যার ফলে কেতাবী নিয়মে পরিপূর্ণভাবে দুরস্ত না হলেও সবগুলো অভিযান সাংঘাতিকভাবে সফল হয়েছিল। সৌভাগ্যবান বটে, তবে তার ব্যক্তিগত সাহসিকতাই তাকে এই সফলতা এনে দিয়েছে। তাই বলা হয় It is not the gun but the man behind the gun which matters. সবগুলো অভিযানের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, ওহাবের দল তাদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়মিত পেয়েছে এবং নিরাপদ হাইড আউট থেকে নিশ্চিন্ত মনে বের হয়ে জনগণের সাথে মিশে যেতে পেরেছিল। এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা একে অপরের মাঝে লীন হয়ে গিয়েছিল যার ফলে সর্বত্রই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা পেয়েছিল, তা না হলে কোনো অভিযানই সফল হত কিনা বলা মুশকিল। অন্যদিকে শত্রুর (পাকবাহিনী) জন্য কোনো কিছুই নিরাপদ ছিল না। যে মাঝি তাকে নৌকা দিয়ে নদী পার করে দিচ্ছে সেও মুক্তিবাহিনীর লোক হতে পারে। যে বালক তাকে পানি সরবরাহ করছে তার কাছেও একটা গ্রেনেড থাকতে পারে। এই বাড়তি মানসিক চাপই শত্রুকে ঘায়েল করেছে সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধটা কিসের জন্য এবং কার জন্য— সে কোনো উত্তর পায়নি তাই যুদ্ধটা তার কাছে যেমন অর্থবহ নয় অন্যদিকে যুক্তবাহিনীর জন্য যুদ্ধ হলো জেহাদ— মৃত্যু মানে শাহাদত। অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে এ মনোবল তাকে দারুণভাবে চাঙ্গা রেখেছে। এটাই তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। তাই বলা হয় সেনাবাহিনী জনগণের ভালোবাসার সাগরে ভেসে ভেসে জনগণের জন্য যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়। সে মৃত্যুতে আছে অনাবিল আনন্দ। আছে গর্ব— যদিও ভয়ংকর তবুও জীবন সেখানে রক্তাক্ত সৌন্দর্যে মহীয়ান হয়ে উঠে।

**মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী, বীর বিক্রম**

জন্ম : ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, ফেনী। শিক্ষা ; ময়মনসিংহের সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৬১ সালে এসএসসি এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে এইচএসসি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ। ৫ই জুন ১৯৬৬ সালে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশন লাভ। মুক্তিযুদ্ধে রাত ৩/৪ আগস্টে শেরপুরের নকশী বিওপি-তে পাকিস্তানি শক্ত অবস্থানের উপর ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তিনি দুইবার আহত হন। সরকার তাকে 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ওমানে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী, বীর বিক্রম বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

# মন্দভাগ ষ্টেশন এলাকার নকশা

উত্তর

মন্দভাগ ষ্টেশন

রঘুরামপুর

রেলওয়ে ট্রলির উপর

অ্যাম্বুশ ১৪-৩০ মিঃ

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের

সালদা

সালদা নদী

০ ১০০ ২০০ গজ

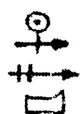
সংকেত

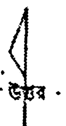
অধিনায়কের অবস্থান

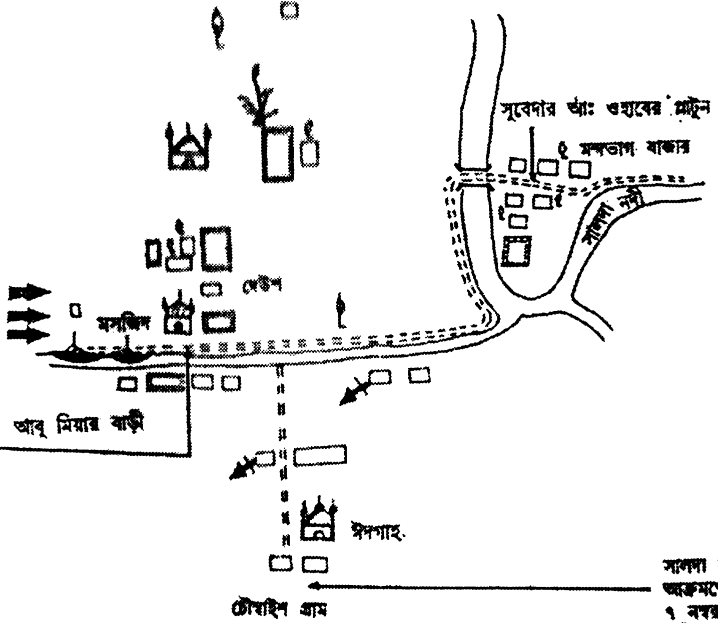
এল এম জি ...

এম জি

শত্রুর ট্রলি ...




শালগড় এলাকার নকশা
উত্তর
শালগড়
মুক্তিবাহিনী দেবীপুর থেকে
মন্দভাগ, কায়েমপুর, চান্দলা
ও সিদনাই গ্রাম হয়ে শালগড়ে
অবস্থান নেয়
সংকেত
অধিনায়কের অবস্থান
দলের বিবৃতি
লক্ষ্যবস্তু
০ ১০০ ২০০ গজ



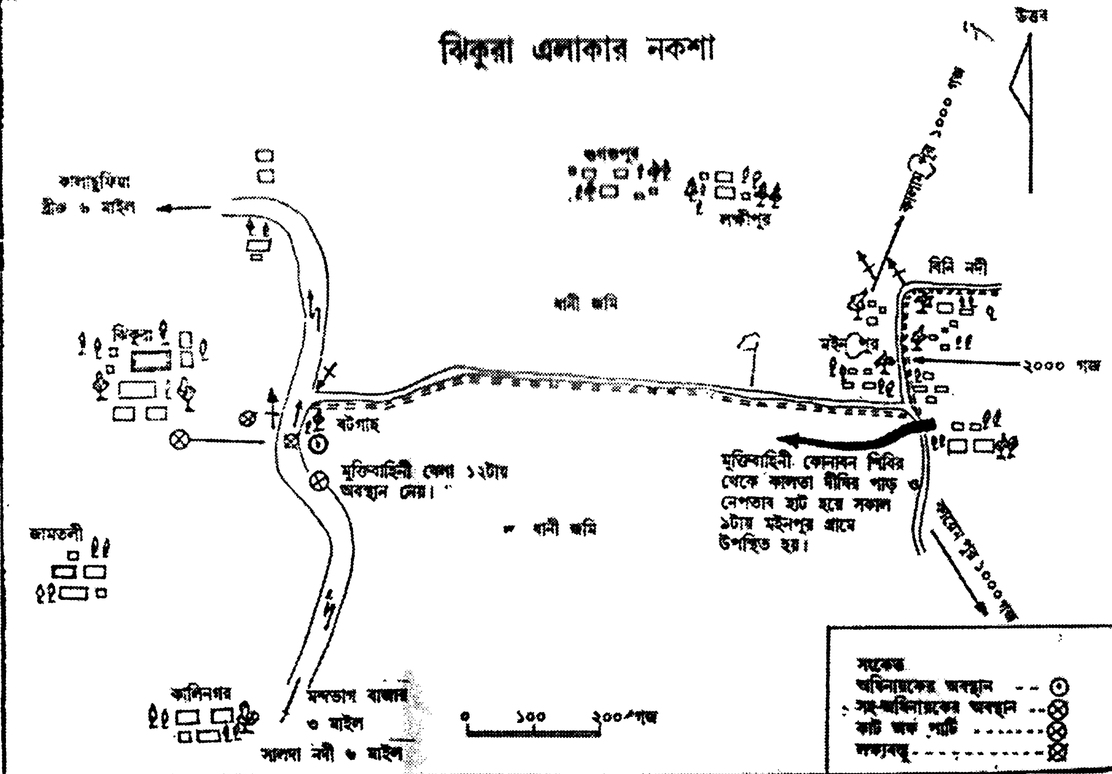
দেউশ-মন্দভাগ বাজার এলাকার নকশা
দোয়াশকান্দা
দেউশ
মসজিদ
সকালে (বেলা ৯/১০টায়)
পাকসেনাদের পাল্টা
আক্রমণ প্রচেষ্টা
আবু মিয়ার বাড়ী
ভোর রাতে নায়েক আতাউর এর
এল এম জি পোষ্ট থেকে
সর্বপ্রথম পাক নৌবহরের উপর
গুলিবর্ষণ করা হয়।
সুবেদার আঃ ওহাবের প্লাটুন
মন্দভাগ বাজার
সালদা নদী
ঈদগাহ
চৌধাইশ গ্রাম
সালদা নদীতে প্রথম
আক্রমণের সময় এখানে
৭ নম্বর প্লাটুনের প্রতিরোধ
ভূমিকা পালন।



০ ১০০ ২০০ গজ



উত্তর


ঝিকুরা এলাকার নকশা
উত্তর
কাদাপুর ১০০০ গজ
বিবি নদী
২০০০ গজ
মইনপুর
লক্ষীপুর
ধানী জমি
কাদাপুছিয়া
ট্রাঙ্ক ৯ মাইল
ঝিকুরা
বটগাছ
মুক্তিবাহিনী বেলা ১২টায় অবস্থান নেয়।
মুক্তিবাহিনী কোনাবন শিবির থেকে কালতা দীঘির পাড় ও নেপতাব হাট হয়ে সকাল ১টায় মইনপুর গ্রামে উপস্থিত হয়।
ধানী জমি
জামতলী
কালিনগর
মন্দভাগ বাজার ৩ মাইল
সালদা নদী ৬ মাইল
০ ১০০ ২০০ গজ
সংকেত
অধিনায়কের অবস্থান
সহ-অধিনায়কের অবস্থান
কাট অফ পার্টি
লক্ষ্যবস্তু

# পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্প এর স্মৃতি

গোলাম মুস্তাফা

বিলোনিয়ার প্রথম যুদ্ধের পর একাত্তরের ২১শে জুন পাকিস্তানির প্রচন্ড গোলাগুলি, সন্ত্রাস, অবিশ্বাস্য রকমের ধ্বংসযজ্ঞ ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিলোনিয়ার ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত এসে আসন গেড়ে বসে। তার আগেই অবশ্য সমগ্র এলাকার জনগণ জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচানোর স্বাভাবিক তাগিদে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত বর্তী এলাকাগুলোতে, বিশেষত বিলোনিয়া শহরে এসে আশ্রয় নেয়। বিলোনিয়া শহর তখন পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনগণ দ্বারা প্লাবিত। ভারতীয় জনগণ হাসিমুখে তাদের বরণ করে নেয় এবং আশ্রয় দেয়। পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি আগেই বিলোনিয়ায় এসে পৌঁছেছিলাম। পথে আমার সাথে যোগ দেয় বন্ধু ওয়ালী। বিলোনিয়ায় পরিচয় হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহাঙ্গীর ও আনসারের সাথে। জাহাঙ্গীর ও আনসার সহ সদ্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী যুবকদের মধ্য হতে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করলাম। সৌভাগ্যবশত বিলোনিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহের তৎপরতা ও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আমাদের ব্যাকুলতা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মেজর প্রধান এর নজরে আসে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের সৎ উদ্দেশ্য সম্মন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তার অধীনস্থ দুটি SHAKTIMAN ব্র্যান্ডের সামরিক ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। হানাদার দস্যুদের মোকাবেলায় সংকল্পবদ্ধ দু'ট্রাক ভর্তি তরুণ ও যুবক নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা যাত্রা শুরু করলাম পালাটানার উদ্দেশ্যে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়গুলো গাড় সবুজ গাছ-গাছালি দ্বারা আবৃত। চারদিকে শুধূ সবুজ আর সবুজ। উপরে নীল আকাশ, মাঝে-মাঝে শ্লথ গতির সাদা মেঘের নীরব আনাগোনা। নির্মল ও ভীষন গতির বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে চুল ও কাপড়-চোপড়। অজানার পথে আমরা। অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার সাথে এক ধরণের রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এগিয়ে চলেছে ভারি সামরিক ট্রাক। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠে যাচেছ ট্রাক একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ব্রেক ফেল করলে অথবা অন্য কোনো কারণে বিপজ্জনক এ রাস্তায় দূর্ঘটনায় পতিত হলে সোজা গিয়ে পড়তে হবে হাজার ফুট নিচের পাহাড়ী খাদে। এ ধরণের দুর্ঘটনার কবলে পতিত, নিচের গভীর খাদে চির নিন্দ্রার শয়নে শায়িত একটি উল্টে যাওয়া ট্রাক দেখা গেল। এতো উঁচু থেকে ট্রাকটিকে লাগছিল একটি ক্ষুদ্র খেলনা ট্রাকের মত। আমাদের ট্রাক এবার ঘুরে ঘুরে নীচের দিকে

নামা শুরু করলো ঘঁ ঘঁ করে, ষাঁড়ের ন্যায়, গোঁয়ারের মতো। পাহাড়িয়া রাস্তায় এ ধরণের ভ্রমণে আমরা কেউই অভ্যস্ত ছিলাম না। ট্রাকে গাদাগাদি করে বসে থাকা ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ভয়ানক রকম বমি শুরু করে দিল। এ ধরণের একটি বমির ধারা তীব্র গতিতে আমার বাম কাঁধের উপর দিয়ে গিয়ে পড়ল আরেক সাথী ভাইয়ের পিঠে। রক্ষা পেলাম অল্পের জন্য। কিন্তু আত্মতৃপ্তির অবকাশ ছিলনা। পরমুহূর্তেই দেখলাম কুলির চেয়ে শত গুণ বেশি তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে বমির আরেক ধারা। সড়াৎ করে মুহুর্তের মধ্যেই সরিয়ে ফেললাম মাথা। ধাঁ করে সেই 'বমি-কুলি' সরাসরি গিয়ে আঁছড়ে পড়ল আরেক সা ি ভাইয়ের গলায় ও বুকের উপরের অংশে। সে এক কান্ড বটে ! যাক, এভাবে বমি। জগতে অবগাহন করতে করতে, হেলে-দুলে, জাম-বানানীর মত ঝাঁকানি খেতে খেতে এবং **"দুর্গম গিরী কান্তার মরু দুস্তর পারাপার ওহে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার"** টাইপের কোরাশ গাইতে গাইতে শেষ পর্যন্ত আমরা এসে পৌঁছুলাম পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পে। ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এমএনএ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস টেষ্ট সহ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সামরিক ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে নিবন্ধন প্রদান করলেন। আমরা সেদিনের জন্য ব্যারাকে চলে গেলাম খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের জন্য।

পালাটানা এলাকাটির অবস্থান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর শহরের ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। পালাটানা প্রাইমারী স্কুল নামে এখানে ছিল একটি স্কুল। স্কুলের সামনে বেশ বড় একটি মাঠ। চারদিকে ছোট ছোট টিলা ও পাহাড়। শান্ত, সবুজ ও মনোরম একটি পরিবেশ। লোক বসতি হালকা। বেশিরভাগ অদিবাসীও বাঙালি হিন্দু। পাহাড়ী এবং মুসলমানের সংখ্যাও অবশ্য একেবারে কম নয়। স্বাচ্ছন্দে ও সহমর্মীতায় তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

বৃটিশ সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সুজাত আলী আওয়ামী লীগ হতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কুমিল্লার দেবীদ্বার এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য। পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা কমান্ড্যান্ট। রাশভারি ধরণের মানুষ। স্বল্পভাষী ও রাগী। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। কিন্তু রেগে গেলে টকটকে লাল। নাকের নিচে কাঁচা-পাকা এক গুচ্ছ গোঁফ। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের জন্য স্থানটি তার খুবই পছন্দ। সানন্দে তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত (ইউনিয়ন পরিষদ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগন। এগিয়ে এলেন স্থানীয় প্রভাবশালী ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জেলা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্কুলটি বন্ধ ঘোষিত হলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য। প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য শুরু হলো প্রচেষ্টা।

স্কুল ঘরটি ছিল মাঠের পূর্ব অংশে। ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর থাকার ব্যবস্থা হল এর একটি রুমে। সাথে থাকত ৮ ও ১০ বছর বয়সী তার ফুটফুটে দুই ছেলে। পাশের রুমটি নির্ধারিত হলো তার কমান্ড্যান্ট অফিস হিসেবে। অন্যান্য রুম ব্যবহৃত হতো চিকিৎসা কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র, ইনষ্ট্রাক্টরদের থাকা ও গুদাম হিসেবে।

মাঠের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিন দিকে উপরে ছন ও চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হল ব্যারাক। উত্তর-পূর্ব কোনায় স্থাপিত হল লঙ্গরখানা, মানে রান্নাঘর। দক্ষিন-পূর্ব পাশে শাল ও গজারী কাঠ দিয়ে নির্মিত হল মেইন গেট। পশ্চিম দিকের ব্যারাকের মাঝামাঝি স্থানে বাঁশ দিয়ে নির্মিত হলো দ্বিতীয় গেটটি। সে গেট হতে ২০ গজ দূরেই দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে তৈরি করা হয়েছে ৩০টি কাঁচা টয়লেট। মাটি থেকে ২ ফুট উঁচুতে বাঁশ ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে টয়লেটগুলো। টয়লেটের কাছাকাছি স্থানে রাখা আছে ৩০টি মাটির বদনা। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির ক্ষীন একটি পাহাড়ি ধারা থেকে বদনায় পানি এনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর সৌচকার্য সম্পন্ন করা হত।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের আকুলতা নিয়ে পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রতিদিন পূর্ব বাংলা থেকে স্রোতের মত তরুন ও যুবক ছেলেরা আসতে লাগল। এদের বেশিরভাগই ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা ও ছোট ব্যবসায়ী ধরনের মানুষ। গড় বয়স ১৫ থেকে ২৮ বছর। ছাত্রদের মধ্যে নবম-দশম শ্রেনী থেকে শুরু করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও ছিল। ট্রেনিংরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই ছিল অধিক।

মেইন গেটের পাশে ছোট একটি রুমে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের শারিরীক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য বাছাই করা হত। পাকিস্তানিদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য কেউ যাতে প্রশিক্ষণার্থীর ছদ্দবেশে ক্যাম্পে ঢুকতে না পারে অথচ যুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক প্রকৃত প্রশিক্ষণার্থীগন যাতে বাদ না যায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ছিলেন বিশেষ সজাগ। শারিরীক ও মানসিক সহ বয়সের কারনে যে সব প্রশিক্ষণার্থী ট্রেনিংয়ের জন্য তথা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য অনেক আকুলী-বিকুলী করেও নির্বাচিত হতে পারেনি তাদের মধ্যে অনেককেই অঝোর ধারায় কাঁদতে দেখেছি।

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সেকশন, প্ল্যাটুন ও কোম্পানিতে অন্তর্ভূক্ত করে শৃংখলার সাথে বিন্যাস করা হল। কোম্পানিগুলোর নাম দেয়া হল এভাবে  আলফা, ব্রাভো, চার্লী, ডেল্টা, ইকো, ফাইটার, গামা, হীরো ইত্যাদি। প্রতিটি কোম্পানিকে তিনটি সেকশনে বিভক্ত করে তিনজন সেকশন কমান্ডার এবং একজন কোম্পানি কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কমান্ডার নিয়োগের পূর্বে শারিরীক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ লিডারশীপ কোয়ালিটির বিষয়ে সাক্ষাতকার ছাড়াও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিলো। আমাকে ফাইটার কোম্পানির কমান্ডার মনোনীত করা হলো। জাহাঙ্গীর ও ওয়ালী যথাক্রমে ইকো ও গামা কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হলো। অন্য কোম্পানি কমান্ডারদের নাম আজ আর কিছুতেই মনে করতে পারছিনা।

প্রত্যেক কোম্পানির জন্য আলাদা আলাদা ব্যারাক তৈরি করা হয়েছিল। ব্যারাকের মাঝখানটা হাটা-চলার জন্য রেখে দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীকেই দেয়া হলো দুটো করে চটের খালি বস্তা, দুটো করে ১০ ইট, একটি এলুমিনিয়ামের থালা ও একটি এলুমিনিয়ামের বড় মগ। আমাদের বলা হলো একটি চটের বস্তা দিয়ে দুটো ইট মুড়িয়ে বালিশ বানাতে এবং বাকি চটের বস্তাটি বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতে। আমরা তাই করলাম। তবে কোমর সহ শরীরের

নীচের অংশ মাটিতেই থাকত। বিছানার পূর্ণতার জন্য অনেক চেষ্টা করেও তৃতীয় একটি বস্তার বরাদ্ধ পাওয়া গেল না ! অনেকেই আমরা পাশের বন থেকে গাছের পাতা সংগ্রহ করে বিছানাগুলোকে বিস্তৃত ও আরামদায়ক করার ব্যবস্থা নিলাম।

ক্যাম্পের লংগরখানায় খাবার তৈরি হত। সকালের পিটি প্যারেডের পরে নাস্তা হিসেবে আমাদেরকে দেয়া হত একটি আঁটার রুটি ও এক মগ চা। দুপুরে বরাদ্ধ ছিল এক প্লেট ভাত ও এক চামচ 'লাবড়া' টাইপের তরকারী। রাতে দুটা আটার রুটি ও এক চামচ ডাল। অবশ্য সপ্তাহে এক বেলা এক টুকরো মাছ অথবা ঝোল সহ ২/৩ টুকরা ছাগলের মাংশ অথবা ঝোল সহ এক টুকরা মুরগীর মাংশ পরিবেশিত হত। সেদিন সকলের চোখে-মুখে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত।

আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেনিং শুরু হওয়ার ৮/৯ দিন পরে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে ওয়ালী সহ ১২ জন ছেলেকে আলাদা করা হল। বলা হল যে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয়/মুক্তিবাহিনীর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির ট্রেনিং প্রদানের জন্য তাদেরকে আসামের কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সকলেই সম্মত। গেটে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িও প্রস্তুত। ক্যাম্পে আমার অন্যতম বাল্যবন্ধু ওয়ালী। অথচ সে চলে যাচ্ছে। মনটা বিষাদে ভরে গেল। অশ্রুসজল নয়নে ওয়ালীকে বিদায় দিলাম। ওয়ালীদের গাড়ি ছেড়ে দেয়ার মুহুর্তেই ভোঁজবাজীর মত ভাড়া করা একটা জীপে এসে হাজির হল আমার দুই প্রিয় বাল্যবন্ধু শহীদ ও মোশাররফ (হারুন)। এক বন্ধু প্রস্থানের প্রাক্কালে দুই বন্ধুর আগমন আমার মনের বিষন্নতা দূর করে দিল। আসার সাথে সাথেই আমাকে সামনে পেয়ে ওরা খুশি ও আনন্দে একেবারে দিশেহারা। যোদ্ধা হিসেবে বাছাই ও দাপ্তরিক অন্যান্য আনুসঙ্গীকতার পরে ওদেরকে ওদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে পৌছে দিলাম। দু'জনকেই হীরো কোম্পানিতে অন্তর্ভূক্ত করা হল। শহীদ পরবর্তীতে হীরো কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিল।

শুরু হলো ট্রেনিং। ভোর বেলা বিউগলের আওয়াজের সাথে সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের সকলেই হাজির হল মাঠে। ইংরেজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে কোম্পানিগুলোকে সাজানো হল। প্রতিটি কোম্পানির সামনে কোম্পানি কমান্ডারদেরকে দাঁড় করান হল। তার পেছনে তিনটি সেকশনকে তিন লাইনে (In 3's) দাঁড় (Fall In) করান হল। প্রতিটি সেকশনের সামনে একেকজন সেকশন কমান্ডার দন্ডায়মান। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কেউ পরে আছে লুঙ্গী, আবার কেউ পরে আছে প্যান্ট। নির্দেশানুযায়ী লুঙ্গীওয়ালাদেরকে 'গোঁচ' (মালকোচা) দিয়ে দাঁড়াতে হল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্ট হতে ছুটিতে আসা, অবসরপ্রাপ্ত অথবা ইউনিট ছেড়ে বেরিয়ে আসা ১৫/১৬ জন হাবিলদার ও নায়েব সুবেদার টাইপের সৈনিক ছিলেন আমাদের প্রশিক্ষক। এদের মধ্যে একজনকে কিছুতেই ভোলা যায়না। তিনি হাবিলদার বারেক। বারেক ওস্তাদ ছিলেন সরল প্রকৃতির, কিন্তু গায়ে-গতরে এবং লম্বায়-চওড়ায় ছিলেন বিশাল। গলার আওয়াজ ছিল বজ্রের মত। ট্রেনিং প্রদানের সময় সে গলা গমগম করত, শোনা যেত বহুদূর পর্যন্ত।

প্রথম দিন ৭ কোম্পানির প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাথমিক (Physical Training) এবং Parrade করিয়ে Attention এর ভঙ্গীতে দাঁড় করানো হল। কিছুক্ষনের মধ্যেই

দু'জন প্রশিক্ষক Escort করে ক্যাপ্টেন সুজাত আলীকে নিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ভাষায় এবং তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে একটি ভাষন দিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধর্মভিত্তিক অবাস্তব রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা কত নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালির শাসিত ও শোষিত হয়েছে ভাষনে তিনি তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮ এর সামরিক শাষন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৮ এর আগরতলা মামলা, ৬৯ এর ছাত্র-গন অভ্যুত্থান, ৭০ এর উপকুলীয় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ছল-চাতুরী, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষন এবং সবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ২৬শে মার্চের আক্রমন ও গণহত্যা সহ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষনার নিখুত বর্ণনা তার ভাষনে উঠে আসে। মন-প্রান ঢেলে দিয়ে স্বল্পতম সময়ে নিখুতভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি উদাত্ত্ব আহবান জানালেন। জবাবে গলা ফাটিয়ে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর" এবং "জয় বাংলা" ও "জয় বঙ্গবন্ধু" স্লোগান দিয়ে এক হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী সেদিন তাদের আবেগ, অনুভূতি ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছিল।

এবার ট্রেনিংয়ের বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করা যাক। সূর্য উদিত হওয়ার প্রাক্কালেই প্রতিদিন ভোর বেলা বিউগল বেজে উঠত। বিউগল বাজার ৫ মিনিটের মধ্যেই আমাদেরকে যার যার কোম্পানি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় In Threes Fall In করতে হত। মিনিট দশেক Left-Right করার পর সারিবদ্ধভাবে একটার পর একটা কোম্পানিকে Double March করতে করতে মূল ফটক দিয়ে বেরিয়ে মেইন রোডে পৌছতে হত। এরপর রাস্তার ডান পাশ দিয়ে ৫ কিলোমিটার দূরের উদয়পুর শহর হয়ে একই গতিতে আবার ফিরে আসতে হত ক্যাম্পে। ক্যাম্পে ফেরার পর আধা ঘন্টা পিটি-প্যারেড এবং তার পর সকালের নাস্তার জন্য আধা ঘন্টার বিরতী। বিরতীর পর এক ঘন্টা বিভিন্ন রকমের শারিরীক কসরত ও কুচকাওয়াজ। পরের এক ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের কলা-কৌশল ও অস্ত্র-সস্ত্রের বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এরপর এগারোটা নাগাদ ছুটি। ছুটির পর কিছুক্ষন বিশ্রাম। বিশ্রামের পর গোসল এবং দুপুরের খাবার। খাবারের পর বিছানায় শোয়ার আগেই গভীর ঘুম।

বিকেল ৪টায় আবার বিউগল এবং হালকা শারিরীক কসরত। তারপর আবার যথারীতি যুদ্ধের কলা-কৌশল ও বিভিন্ন সমরাস্ত্রের উপর থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিকেল ক্লাশ। থ্রি-নট-থ্রি (303) রাইফেল, সেল্‌ফ লোডিং রাইফেল (এসএলআর), সাব মেশিন কার্বাইন (এসএমসি), লাইট মেশিনগান (এলএমজি), মেশিন গান, ২ মর্টার, HE 36 Hand Granade সহ যাবতীয় ক্ষুদ্রাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম ও কার্য্যক্রম মুখস্ত করা, এসব অস্ত্রের বিভিন্ন অংশ খোলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা আবার যথাস্থানে লাগানো এসব অস্ত্র বহন ও শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্যকরভাবে ব্যবহার করা, বিভিন্ন অস্ত্রের কার্য্যকর ভিন্ন ভিন্ন Range, Minor repair এবং Maintenance সহ যাবতীয় বিষয়ে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে ছুটি। এক ঘন্টা

বিশ্রাম। তারপর রাতের খাবার। রাত ন'টার পরপরই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হত। মোটামুটি এই ছিল আমাদের প্রশিক্ষণকালীন রোজনামচা।

এভাবে এক মাস ট্রেনিং চলার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টের ধর এর নেতৃত্বে একটি টিম আমাদের ক্যাম্পে আসেন। তারা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর টিমটি থেকে প্রশিক্ষণের বাকি অংশের দায়িত্ব বুঝে নেন। পরবর্তী ১৫ দিন ভারতীয় টিমই আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সৈনিকগন আমাদেরকে মূলত 'কনভেনশনাল ওয়ার' এর ট্রেনিং দিয়েছিলেন। ভারতীয় ইন্সট্রাক্টরগন প্রচলিত যুদ্ধ ছাড়াও আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংও দেন। গেরিলা যুদ্ধের জন্য ক্ষীপ্রতা ও বিদ্যুৎময় গতি সহ তারা আমাদেরকে Anti Tank মাইন, Anti Personnel মাইন এবং Explosive এর সাহায্যে Demolition এর ট্রেনিংও প্রদান করেন।

যুদ্ধের মৌলিক কলা-কৌশল সহ দেশের সব আর্মির জন্যই মোটামুটি একই রকম। অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারনে Operational plan অনেক সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হতেই পারে। কিন্তু আমাদের ধারণা, পাকিস্তানি আর্মি এবং ভারতীয় আর্মির মধ্যে মানসিকতার কিছু পার্থক্য আছে। উভয় সেনাবাহিনীই বৃটিশ সেনাবাহিনীর স্টাইলে পেশাগতভাবে চমৎকারভাবে প্রশিক্ষীত। তবে পাকিস্তানি বাহিনীকে আমাদের যখন মনে হয়েছে উগ্র, অস্থীর, চঞ্চল এবং ইমোশনাল তখন ভারতীয় বাহিনীকে আমাদের মনে হয়েছে অপেক্ষকৃত শান্ত, অচঞ্চল ও ধৈর্য্যশীল। হয়তো খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না, তবুও ভিন্ন ধরণের একটি উদাহরণ দেই। পাকিস্তানিদের স্টাইলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ইন্সট্রাক্টরগন পিটি-প্যারেড এর সময় কমান্ড দিতেন এভাবে  লেফ্‌ট-রাইট-লেফ্‌ট, রাইট টার্ন, লেফ্‌ট টার্ন, এবাউট টার্ন, কুইক মার্চ, ডবল আপ, হল্‌ট্‌ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ভারতীয় ইন্সট্রাক্টরগন কম্যান্ড দিতেন এভাবে  সাবধান, ডানে মোড়, বাঁয়ে মোড়, পিছন ফির, এগিয়ে চল/আগে বাড়, জোর কদম, থাম ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের ৪৩তম দিনে আমাদেরকে বলা হল যে আমাদের সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং শেষ হয়েছে। পরদিন হবে প্র্যাকটিকাল ফায়ারিং ট্রেনিং ও টেষ্ট। পরদিন সকালে Fall In এর পর আমাদেরকে মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হল ৬/৭ কিলোমিটার দূরে পর্বতময় গভীর এক জংগলে। সেখানে এমন এক স্থানে তাঁবু দিয়ে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা ছিল যার এক দিকে ছিল গভীর অরণ্য এবং অন্য দিকে ছিল খাড়া পাহাড়। মাঝখানের স্থানটি সবুজ ঘাসময় একটি সমভূমি। পাহাড়ের গায়ে ২৫/৩০ টি স্যুটিং স্পট। সাদা রং এর গোলাকার স্পটগুলোর মাঝখানটা আবার গোলাকার লাল রং দিয়ে তৈরি। স্পটগুলো হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে সমতল ভূমির উপর দিয়ে বালির বস্তার উপর রাখা আছে একেকটি ৩০৩ রাইফেল। প্রতি ব্যাচে ২৫/৩০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীকে ১০টি করে গুলি দিয়ে হুইসেল দেয়া হত। সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে ম্যাগজিনে গুলি লোড করে বালির বস্তার এপাশে পজিশনে গিয়ে নির্দিষ্ট স্পট লক্ষ করে "ফায়ার" (!) বলার সাথে সাথে পরপর ১০টি গুলি ফায়ার করা চলল। আমরা খুবই উত্তেজিত ছিলাম। কারন দেড় মাসের কঠোর-কঠিন ট্রেনিং এর পর এই প্রথম বাস্তব

অনুশীলন এবং তাজা গুলি ফায়ার করার বাস্তব সুযোগ আমরা পেলাম।

যাদেরই গুলি করা শেষ তাদেরকেই আবার মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হল এমন এক স্থানে যার সামনে একটি বালির বাঁধ এবং বাঁধের অপর দিকটা ৫/৬ ফিট নিচু। এখানে আমাদের সকলের হাতেই দেয়া হলো একটি করে তাজা HE 36 হ্যান্ড গ্রেনেড। "রেডী" বলার সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে লিভার সহ গ্রেনেডটি শক্ত করে ধরে দাঁত দিয়ে সেফটি পিন খুলেই আমরা পজিশনে চলে যেতাম। "চার্জ" বলার সাথে সাথে পেছন হতে হাত ঘুরিয়ে সামনের অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ করে সজোরে আমরা গ্রেনেড ছুড়ে মারতে থাকলাম। ২৫/৩০টি গ্রেনেড একসাথে বিস্ফোরিত হবার যে Impact, কান ফাটানো আওয়াজ এবং বিপুল পরিমান মাটি আকাশে উত্থিত হতে থাকল সে অপূর্ব দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। রাইফেল দিয়ে জীবনের প্রথম গুলি ছোড়া ও স্বহস্তে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করার দারুন অভিজ্ঞতা সহ তৃপ্ত মন নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মার্চ করে শৃংখলার সাথে আমরা আবার আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে শুরু হলো সমাপনী কুচকাওয়াজ। আমাদের ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন সুজাত আলী কুচকাওয়াজ উপভোগ করলেন। আমরা তাকে **'গার্ড অব অনার'** প্রদান করলাম। উদ্দীপক ভাষায় তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ন ভাষন দিলেন। নির্ভেজাল দেশপ্রেম এবং জনগনের জান মালের নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনায় রেখে আমরা যেন প্রদত্ত ট্রেনিং সদ্ব্যবহার করে যুদ্ধে অর্থবহ অবদান রাখতে পারি সে ব্যাপারে তৎপর থাকার জন্য তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করে স্বল্পতম সময়ে দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে তিনি আমাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানালেন। আমাদের সকলের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে এবং স্বাধীন বাংলায় ফের দেখা হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন। তার বক্তব্যের পরপরই আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনটি টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে শুনান হল। সে ভাষন শোনার পর আমরা যেন লাখো গুনে উজ্জীবিত হলাম, অস্থীর হয়ে গেলাম যুদ্ধের ময়দানে পাকিস্তানি বর্বরদের মোকাবেলা করার জন্য। ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এরপর আমাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। বেলা সাড়ে বারোটায় আমাদেরকে সেদিন উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হল।

বেলা ১২টার মধ্যেই গেটের বাইরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাক এর একটি বহর এসে পৌছল। খাওয়া-দাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এলাকাভিত্তিক ভাগ করা হলো। ততদিনে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পূরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দান করেছে। প্রধান সেনাপতি হিসেবে আগেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। সদ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনস্থ ২ নং সেক্টরের বিভিন্ন সাব-সেক্টর কমান্ডারদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হল। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে ট্রাকবহর বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। সাব-সেক্টর কমান্ডারগন নবাগত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র-সজ্জিত করে এবং ব্রিফিং দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিবেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, নির্ধারিত অঞ্চলে। সব

শেষে ফেনী অঞ্চলের এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আমার কমান্ডে ন্যস্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হলো বিলোনিয়া সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের নিকট।

পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্প এর সুখ-দুঃখের আরো কিছু স্মৃতি :

ক. **পিটি ও ড্রিল এর প্রাথমিক ধকল** ভোর বেলা প্রতিদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার দৌড়ানো আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিলো। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এত ঘন ও গভীর হতো যে, প্রথম প্রথম মনে হতো, নাকের ভেতর থেকে বাতাস বেরুনোর সময় যেন ছুরির আঁচড়ে আঁচড়ে তা ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে, বিশেষ করে ফেরত পথে, অনেককে রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়তে দেখেছি। কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হয়েছে। অবশ্য ১০/১২ দিন পরে এ দৌড় আমাদের প্রায় সকলের কাছেই অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছিল।

খ. **টয়লেট অভিমুখে শেষ রাতের লাইন :** প্রায় ১০০০ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য টয়লেট ছিল মাত্র ৩০টি। ভোর বেলা বিউগল বাজার সাথে সাথে ট্রেনিংয়ের জন্য সকলকেই মাঠে সমবেত হতে হত। সুতরাং শেষ রাতের দিকেই, ভোর হওয়ার বেশ আগেই, ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে আমাদেরকে উঠতেই হত। উঠেই টয়লেট সহ হাত-মুখ ধোয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হত লাইনে। পরিস্থিতির কারনে, অন্য বন্ধুদের যেন অসুবিধা না হয় বিবেকের সে তাড়নায়, দ্রুততম গতিতে টয়লেট সারার একটা অভ্যাস আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তবে ট্রেনিং এর মাঝামাঝি সময়ে অনেকের মধ্যেই আমাশয়ের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল এবং টয়লেট-স্বল্পতার কারনে ভোর রাতে যে লম্বা লাইন হত তাতে তাদের বড় কষ্ট হত।

গ. **আহলাদী ছেলেটি মারাই গেলো !** দূঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ মনে পড়ছে ফুটফুটে একটি ছেলের কথা। ছেলেটির বাড়ি ছিল নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে। সে নবম শ্রেনীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্প এ যোগ দেয়। তার মায়াবী চোখ, সহজ-সরল হাসি এবং অমায়িক ব্যবহার আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করত। তার নাম এতোদিন পরে কিছুতেই আর মনে করতে পারছিনা। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে তার মা-বাবার অত্যন্ত আদরের একমাত্র ছেলে ছিল। তার দু'টো ছোট বোন ছিল। 'মা'-বাবা, বিশেষত ছোট বোনগুলোর কথা মনে পড়লে প্রায়ই সে বিষন্নতায় আক্রান্ত হতো এবং আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ত। আমরাও, নিজের অজান্তেই, সে কান্নায় শরীক হয়ে যেতাম। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সেই ছিল সর্ব কনিষ্ঠ এবং একটু আহলাদী ধরণের। ইনস্ট্রাক্টরা সহ আমরা সকলেই তাকে খুবই স্নেহ করতাম। আমরা তাকে আশ্বস্ত করতে চাইতাম এই বলে যে, ট্রেনিং শেষে যুদ্ধ করে, জালিমদেরকে বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়ে, আল্লাহ্‌র রহমতে নিশ্চয়ই একদিন আমরা বাংলাদেশকে শত্রু-মুক্ত করব, ছিনিয়ে আনব প্রিয় স্বাধীনতা। সে তখন বীর বেশে মা'র কোলে ফিরে যেতে পারবে। আমাদের কথায় সে

আস্বস্ত হত। বলত, আপনারাও যাবেন আমার সাথে, আমাদের বাড়িতে। আমার মা'র হাতে বানান মজাদার পিঠা, বিশেষ করে নারকেলের পিঠা খেলে আপনারা একেবারে পাগল হয়ে যাবেন। নাম ভূলে যাওয়া সে ছেলেটির হঠাৎ আমাশয় হল। ক্যাম্পে কোনো ডাক্তার ছিল না। স্থানীয় একজন কম্পাউন্ডার মাঝে-মধ্যে ডাক দিলে আসতো এবং অসুস্থ্যদেরকে ঔষধ দিত। বেশিরভাগ সময়েই ওইসব অষুধে কাজ হতনা। আমাশয় শেষ পর্যন্ত রক্ত আমাশয়ে রূপ নিল এবং মাত্র কয়েকদিনের অসুখেই এক বিষন্ন সন্ধ্যায় ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। সারারাত আমরা তার মৃতদেহ নিয়ে বসে রইলাম। বোবা কান্নায় এবং হাজারো বন্ধুর চোখের জলে সে রাত যে কত কষ্টের, কত বেদনার, কত অসহনীয় এবং দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল তা আজ আর কিছুতেই কাগজ-কলম দিয়ে বিমূর্ত করে তোলা যাবেনা। শেষ রাতে আমরা তাকে শেষ গোসল করালাম এবং ফজরের নামাজের পরে জানাজা শেষে এলাকার মুসলমানদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহীত করা হল। শোকাহত মন এবং একটি বিশাল শুন্যতা নিয়ে সেদিন আমরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে এসেছিলাম। ছেলেদের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ সেদিনকার সকালের ট্রেনিং বাতিল ঘোষনা করলেন। সারাটা ক্যাম্প জুড়ে কবরের নিস্তব্দতা। প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও শোকে সকলেই যেন নির্বাক ও মুহ্যমান।...

ঘ. **চলে গেল জাহাংগীর ও আনসার :** ট্রেনিংয়ের মাঝামাঝি সময়ে একদিন হঠাৎ আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন ছাত্রলীগ এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব আসম আবদুর রব। রব ভাই ক্যাম্প কমাড্যান্ট ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর সাথে কিছুক্ষন একান্তে কথা বললেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে দেশকে দ্রুততম সময়ে হানাদার-মুক্ত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং বঙ্গবন্ধু'র আজন্ম লালিত স্বপ্ন "সোনার বাংলা" গড়ার জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। ফিরে যাওয়ার সময় তিনি সাথে করে জাহাঙ্গীর ভাই ও আনসার ভাইকে নিয়ে গেলেন। এরা দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্র লীগের মধ্যম স্তরের নেতা হওয়ায় রব ভাইয়ের সাথে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে শুনেছি অন্যান্য অনেকের সাথে এদের দু'জনকেও Bangladesh Liberation Front তথা BLF এর সদস্য হিসেবে আলাদা ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।

জাহাংগীর ও আনসারের সাথে সেই বিলোনিয়াতে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের সময় থেকেই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাল্যবন্ধু ওয়ালীর পর এদেরও হঠাৎ চলে যাওয়া এবং সর্বকনিষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থী ভাইটির অকাল মৃত্যু তাই আমার মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

ঙ. **গোমতীতে জলকেলি।** আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প এর কাছেই কয়েকটি স্বচ্ছল মুসলমান পরিবারের বাড়ি ছিল। বলা যায়, এলাকায় তারাই ছিল সবচেয়ে ধনী। প্রচুর জমির মালিক তারা। হালের বলদ ছাড়াও তাদের ছিল বিপুল

সংখ্যক গরু ও মহিষ। তাছাড়া ছিল অনেক কামলা ও কৃষি-শ্রমিক। তাদের বাড়ির সামনের পুকুরটি ছিল বেশ বড় এবং গভীর। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি দিঘি। পানি ছিল স্বচ্ছ, স্ফটিকের মতো পরিষ্কার। কিন্তু সে পুকুরে গোসল করতে গেলে আমাদেরকে বাধা দেয়া হল। খুবই খারাপ লাগল। তবে সামান্য কিছু দূর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছিল গোমতি নদী, যা ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে কুমিল্লা হয়ে মেঘনা নদীতে গিয়ে মিসেছে। অগত্যা শিক্ষাণবিস মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে 'গোমতী' নদীতেই চলে গেলাম। আমাদের ট্রেনিং সেন্টার থেকে গোমতী তেমন দূরে নয়। মিনিট দশেকের পথ। পাহাড়ি অঞ্চল হওয়াতে এখানকার গোমতী বেশ খরস্রোতা। বহতা নদীতে সাঁতার কাটা আমার অনেক দিনের শখ। গোমতীর পানির স্রোত তীব্র হলেও বেশ পরিষ্কার। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত সকলে মিলে খুব করে সাঁতার কাটলাম। প্রবাহমান জলে স্নান করে দেহ-মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। এভাবে দু'একদিন পরপরই আমরা গোমতীতে জলকেলীতে মত্ত হয়ে যেতাম। সবুজের অবারিত বিস্তৃতি ও নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে কুলকুলু রবে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ ও শীতল পানিতে প্রাণ ভরে অবগাহন করার মধ্যে যে কী অপার আনন্দ ছিল তা আজ শুধু কল্পনাতেই মানায়।

কেন সেই মুসলমান পরিবারগুলো তাদের বাধানো ঘাটের দিঘিতে আমাদেরকে গোসল করতে বারণ করল ? কারণ জেনেছি অনেক পরে। ভারতের ওই অঞ্চলের ধন্নাঢ্য পরিবার ছিল তারা। যাকে বলে গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান ও পুকুর ভরা মাছ। বাড়ির পূর্ব অংশে পুকুরের উত্তরাংশে তাদের পারিবারিক কবরস্থান আর দক্ষিনাংশে সমজিদ। বাড়ী-ঘর, মসজিদ, টয়লেট সবই পাকা। পরিপূর্ণ সামজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করছে তারা। এক কথায় সুখী ও সমৃদ্ধশালী বেশ বড় কয়েকটি পরিবার।

তবে এতসব সত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়াতে তারা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সম্ভবত সব দেশের সব সংখালঘুদের মধ্যেই এধরণের নিরাপত্তাহীনতা ও হীনমন্যতাবোধ কাজ করে। এসব কারনেই পাকিস্তানের অখন্ডতা ও অস্তিত্বের ব্যাপারে তারা একটু হলেও উদ্বিগ্ন ছিল। ভারতের সহায়তায় ট্রেনিং নিয়ে, যুদ্ধ করে, পাকিস্তান ভেঙে আমরা বাংলাদেশ গড়র - এ কারনে তারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেশিরভাগই নিয়মিত নামাজ-কলেমা পড়ত। শুক্রবারে প্রায় সকলেই দল বেধে আমরা সেই মুসলমান বাড়ির মসজিদে জু'মার নামাজ পড়তে যেতাম। প্রথম দিন তারা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শুধুই বাঙালি, মুসলমান নয় ! বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার স্থান সংকুলানের জন্য তারা মসজিদের সামনে বাঁশ-ছন দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করল। পরবর্তী জু'মার দিনগুলতে তারা আমাদেরকে হাসি মুখে এবং প্রসন্ন চিত্তে বরণ করত। এমনকি তাদের পুকুরে গোসল করার

জন্যও আমন্ত্রন জানাল এবং আগের রুঢ় আচরনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। ক্রমে তাদের সাথে আমাদের আন্তরিক একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। মসজিদে দেয়া শিন্নি (ফিরনি) খেতে খেতে আমি যখন আমাদের ভাষার ব্যাপারে পাকিস্তানিদের নগ্ন হামলা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য, হত্যা, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের কথা বললাম, তখন তারা সত্যিই ব্যথিত হল। পাকিস্তানি মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি বালিকা, কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধাদেরকে নির্বিচারে ধর্ষনের কথা যখন বললাম, তারা 'আসতাগফিরুল্লাহ', 'নাউযুবিল্লাহ' বলে হাহাকার করে উঠল। মুসলমান হয়ে ইসলামের নামে এবং পাকিস্তানের অখন্ডতার নামে নারী ধর্ষন ? ! পাকিস্তানের 'বরবাদীর' আর বেশি দিন বাঁকি নেই - মন্তব্য মসজিদের বয়োজৈষ্ঠ ইমাম সাহেবের। পাকিস্তানিদের প্রতি তারা শুধু ধিক্কারই জানালোনা, আমাদের প্রতিও হয়ে উঠল সহানুভূতিশীল। পরবর্তীতে জু'মার নামাজ শেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য দোয়াও করা হত।

চ. **ডাইলে যখন পানি দিতে শিখেছি**। 'গোমতী'তে গোসল শেষে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যখন আমরা ফিরতাম তখন ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করত। গোগ্রাসে চলত খাওয়ার পালা। কি খেতাম আমরা ? একটু বর্ণনা দেই। সকালে পিটি-প্যারেডের পর এক মগ চা ও একটি আঁটার রুটি অথবা এক স্লাইস ভারি পাউরুটি। সারা দিনের ট্রেনিং এর পর দুপুরে বড় চামুচের এক চামুচ ভাত ও ছোট এক চামুচ লাবড়া টাইপের তরকারি। বিকেলের ট্রেনিং এর পর সন্ধ্যায় এক চামুচ ডাল এবং একটি বড় সাইজের আঁটার রুটি। ভাত ছিল রাবারের মত মোটা চাউলের। ভাত এবং রুটিতে প্রায়ই বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন সাইজের প্রচুর পোকা পাওয়া যেতো। আপত্তি সত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় চোখ বন্ধ করে সেই খাবারই আমাদেরকে খেতে হত। তাছাড়া বিবেকও খরচ করতাম আমরা। আমরা বুঝার চেষ্টা করতাম যে, আমাদের দেশ বেদখল হয়ে গেছে। সেখানে চলছে অমানবিক কর্মকান্ড, হত্যা, ধর্ষন, লুটতরাজ সহ ধ্বংশযজ্ঞ। ভারতে আমরা অন্তত আশ্রয় পেয়েছি, ট্রেনিং পাচ্ছি এবং গুনগতমান সহ পরিমান কম হলেও রেশনের মাধ্যমে ফ্রি খাওয়া পাচ্ছি, পাচ্ছি মহা মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ। আমাদের কমান্ড্যাট ক্যাপ্টেন সুজাত আলীও এই পরিস্থিতিতে এর চাইতে বেশি আর কি-ইবা করতে পারেন ! আমরা এটাও বুঝার চেষ্টা করতাম যে, ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগন বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, ফ্রি রেশন দিচ্ছে, স্বাধীন বাংলা সরকারকে তাদের কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে সর্বপ্রকার সহায়তা দিচ্ছে। না দিলে কোথায় যেতাম আমরা ? সূতরাং লা-জওয়াব !

কিন্তু একদিন সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। গোমতি-ফেরত ছেলেরা খেতে বসে হৈ চৈ শুরু করে দিল। উল্টে ফেলে দিল এক হাঁড়ি ভাত। চিল্লাচিল্লির এক পর্যায়ে শুরু হল মিছিল ও শ্লোগান। ছুটে গেলাম। দেখি, ভাতের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কালো শক্ত পোকা। সংখ্যায় কম হলেও গা শিউরে উঠার

মতো নরম এবং সাদা এক ধরনের লম্বা পোকাও ভাতের মধ্যে বিদ্যমান। যে ডাল আমরা খেতাম, সব সময়ই তা ছিল অতীব পাতলা। কিন্তু আজকের ডাল দেখে মনে হচ্ছে হালকা হলুদাভ গোমতি নদীর টলটলে পানি। ছেলেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিছুতেই এ ধরনের খাবার তারা আর খাবেনা। ক্যাম্প কমান্ড্যাট আমাকে সহ সব কোম্পানি কমান্ডারদেরকে ডেকে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। আমরা সবাই ব্যর্থ হলাম। ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের এক ভাই আমাদের ক্যাম্পে থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন হেডমাষ্টার। মাষ্টার সাহেব হঠাৎ রেগে গেলেন এবং সবাইকে তীব্র ভাষায় তাদের আচরনের জন্য বকা-ঝকা শুরু করলেন। ফল হল বিপরীত। ছেলেরা আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে গেল এবং লংগরখানায় ভাংচুর শুরু করে দিল। ছেলেদেরকে শান্ত করার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন কেন জানিনা সকলে মিলে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার একক দায়িত্ব আমার উপর চাপাল। ভয়ানক এ পরিস্থিতিতে ছেলেদেরকে শান্ত করতে যাওয়াটাও ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু কিছুতো একটা করতেই হবে। এটা একদমই ঠিক যে, অল্প সময়েই মিলিটারী ট্রেনিং শেষ করতে হবে বলে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিরতিহীন ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। অথচ খাবারের পরিমান ও গুনগত মান ছিল খুবই অপ্রতুল ও নিম্ন। পরিশ্রান্ত শরীরের চাহিদার তুলনায় এ খাবার একেবারেই অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় সংকল্প সহ প্রাণের আকুলতার কারনেই মাটি কামড়ে আমরা এখানে পড়ে আছি, নিচ্ছি কঠিন অনুশীলন ও কষ্টকর সামরিক প্রশিক্ষণ। আহা, দেশপ্রেমের এ প্রণোদনা আর স্বদেশের তরে জীবন উৎসর্গ করার প্রত্যয়দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এ আত্মত্যাগ বুঝবেতো পরবর্তী প্রজন্ম, যাদের হাতে ঘাম, রক্ত আর অবর্ননীয় কষ্ট মাখা প্রিয় স্বাধীনতা আমরা তুলে দিয়ে যাবো ?

বেশি চিন্তার অবকাশ ছিলনা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম বিক্ষুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জটলার দিকে। একা। হাতে হাতল ভাঙা একটা কাঠের চেয়ার। কাছে গিয়ে চেয়ারটা রাখলাম মাটিতে এবং উঠে দাঁড়ালাম তার উপর। এরপর বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ নকল করে শুরু করলাম এক অগ্নিধরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা। কিছুক্ষণ পর চেঁচামেচি ও শ্লোগান বন্ধ হয়ে গেলো। পাকিস্তানি হারামী ও জালিমরা কীভাবে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনেছে, কতো নির্মমভাবে অর্থনৈতিকভাবে শোষন করেছে, রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছে এবং জাতি ও মানুষ হিসেবে পদে পদে বাঙালিদেরকে অপমান, অপদস্থ করেছে তার উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার এক পর্যায়ে সবাই স্তব্ধ হয়ে আমার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। পৌরুষদীপ্ত শৌর্য-বির্য আর আকাশ সমান সাহস নিয়ে বাঙালির ক্যাঁচকা মাইর আর গুল পিটুনি দিয়ে পাকিস্তানি কুত্তাদের বাংলার মাটি থেকে তাড়ানোর বজ্র কঠীন শপথ নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানালাম। এরপর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনের আদলে দরাজ গলায় বললাম : "ডাইলে যখন পানি দিতে শিখেছি, আরো পানি মিশাব, প্রয়োজনে আমৃত্যু না খেয়েই বাংলার মাটিকে শত্রু-মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ"। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

তুমুল করতালি হলো। শ্লোগানে শ্লোগানে মুক্তিযোদ্ধারা গলা ফাটাল "জয় বাংলা", বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা মেঘনা যমুনা, জয় বাংলা ইত্যাদি। সংকট কেটে গেল। টলটলে পানির মত ডাল দিয়ে পোকা ভর্তি মোটা চালের রাবারের মত ঠান্ডা দূর্গন্ধযুক্ত ভাত খেয়ে মালকোঁচা এঁটে মুক্তিসেনারা সুশৃংখলভাবে মাঠে গিয়ে দাঁড়াল প্রশিক্ষনের জন্য। আজ আর ভাগ্যে বিশ্রাম নেই। কারন ভাতের পোকা মাকড় আর ডালের পানির জটিলতা নিয়ে অনেক মূল্যবান সময় হারিয়ে গেছে। সময় হয়ে গেছে বৈকালিক প্রশিক্ষণের !

ছ. **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান :** প্রতি সন্ধ্যায় মাঠের মাঝখানে একটি ছোট্ট গোল টেবিলে এনে রাখা হত একটি রেডিও। ক্যাপ্টেন সুজাত আলী আমাদের জন্য এটি কিনেছিলেন। সন্ধ্যার পর সুজাত আলী সাহেব, ইন্সট্রাক্টরগন এবং আমরা সকলেই গোল হয়ে বসে পড়তাম এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সামরিক বিবেচনায় পূরো বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ, সেক্টরের অধীনস্থ বিভিন্ন রণাঙ্গনের সংবাদ, বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সফল অভিযান, নতুন মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শ্রী দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় পঠিত খবরের মধ্যে শরণার্থীদের সমস্যা, দেশে-বিদেশে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের জনমত গঠন, কুটনৈতিক তৎপরতা ও প্রশাসনিক নির্দেশনা সহ দেশাত্মবোধক গান শুনতাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের দ্বারা পাকিস্তানের পক্ষে দালালী এবং বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা, রাজাকার ও শান্তি কমিটি সহ (না)পাক বাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতার খবরাখবরও আমরা শুনতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঢাকাইয়া ভাষায় জনাব এম. আর. আখতার মুকুল পঠিত **"চরমপত্র"** আমাদেরকে খুবই আনন্দ দিত। চরমপত্রের দু'একটি নমুনা পাঠকদের উপভোগের জন্য এখানে তুলে ধরছি :

- ঢাকা শহরে আবার পইট্ কারবার হইছে। খবর পাইয়া গবর্ণর ঠ্যাটা মালেক্যার কি কাঁপুনি ? বেডার ফুলপ্যান্ট অক্করে ভিইজ্যা গ্যাছে। এই বিচ্ছুগুলা মানুষ না আর কিছু ? এরা আইয়ুব খানের পেয়ারা প্রাক্তন গবর্ণর মোনায়েম খাঁ-রে মার্ডার করছুইন। বুধবার রাইতে মাত্র দুইজন বিচ্ছু এই কারবার করছে। সাত বছরের গবর্ণর মোনাইম্যারে বিচ্ছুগুলা খোদ ঢাকা টাউনে মেরামত কইর‍্যা ফেলাইছে। লগে লগে মছুয়ারা বেডারে মেডিকলে আনছিলো। হারা রাইত ধইর‍্যা দম খিঁচ্‌তে খিঁচ্‌তে বৃসসুদবার আল্লার রাইত পোহানের লগে লগে মোনাইম্যায় অক্করে ফ্যাল্ পাইড়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার' কইছুইন'।...

  আত্‌কা আমাগো ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসে ঠাস্ কইর‍্যা একটি আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। ব্রিগেডিয়ার বশীরের

কাছ থাইক্যা টেলিফোনে মোনাইম্যার মার্ডার হওনের খবর পাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলেন।

...এই দিক্কার কারবার হুনছেন নি ? লন্ডনের সানডে টাইম্স মতিঝেলে বিচ্চুগুলা যে বোমাবাজী করছে তার ফডো ছাপাইয়া দিছে। ছদর ইয়াহিয়ার কি রাগ ! ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসের পোয়া মাইলের মাইদ্দে এই রকম কারবার কেমতে হইলো ? জেনারেল পিঁয়াজী, ঠ্যাটা মালেক্যায় কি বইস্যা বইস্যা গাব দিতাছে নাকি ? Sunday Times-এর এক সাদা চামড়ার আংরেজ রিপোর্টার বঙ্গাল মুলুকের হগ্গল রিপোর্ট আর পিকচার বগলদাবা কইর‍্যা অক্করে লন্ডনে যাইয়া হাজির। ব্যাডায় লিখছে, খোদ ঢাকা টাউন আর তার আশেপাশে বিচ্চুগুলার বেশুমার কারবার চলতাছে। পরায় আটশ' বিচ্চু এই কামের মধ্যে লাইগ্যা পড়ছে। দিন্‌কা দিন হেইগুলার লম্বর বাইড়্যা যাইতাছে।

সাদা চামড়া দেইখ্যা জেনারেল রাও ফরমান আলী অক্করে খুশিতে গুলগুল্লা ! ব্যাডায় একটুক ঘোরাঘুরি করবার পারমিশন দিছিলো। ব্যাস্ উল্‌ডা কারবার হইয়া গেছে। আংরেজের বাচ্চায় লি্খখিস্, ঢাকায় মছুয়ারা কতকগুলা কাঠের মিস্ত্রী ধইর‍্যা নিয়া রাইত দিন লম্বা লম্বা সাইজের বাক্স বানাইতাছে। হানাদার অফিসাররা পটল তোলনের লগে লগে এইসব বাক্সের মাইদ্দে ভইর‍্যা সব লাশ পাকিস্তানে পাডাইতাছে। পি. আই. এ. লাশ-ঢওয়াইন্যা খেপ মারতে মারতে অস্থির হইয়া উঠছে। Sunday Times-এর রিপোর্টার আর একটা জব্বর কথা কইছে। বঙ্গালা মুলুকে এখন এক লাখ বিচ্চু ইচ্ছামতো কারবার কইর‍্যা চলতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় বিচ্চুরা ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে। আর মচুয়ারা বাংকারের মধ্যে বইস্যা খালি ইয়া নফ্‌সি, ইয়া নফ্‌সি করতাছে। এই দিকে গেল এতোয়ারের রাইতে রেডিও গায়েবী আওয়াজ অক্করে কাপে-কাপের কারবার কইরা বইছে। এক ব্যাডায় লেকচার দেওনের টাইমে কইছে, 'হানাদার সোলজারগো শ্যাষ পর্যন্ত পালাইতেই হইবো। এগো Mind খুবই দুব্‌লা। এরা হগ্‌গলেই ভেড়ুয়া মার্কা। কেইসডা কি ?

হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যায় বলে কত জল ? জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল টিক্কার মতো ব্যাডারা থুড়ি মাইরা বাহাত্তুর ঘন্টার মাইদ্দে বঙ্গাল মুলুক দখল করবো বইল্যা যে চাপাবাজী করছিল হেই ওমর, মিঠ্‌ঠা, পীরজাদা, টিক্কা হগ্‌গলেই লেজ গুটাইয়া রাওয়ালপিন্ডিতে ভাগ্‌ছে। সব মওলবী সা'বেই অখন বঙ্গাল মুলুকের বেলায় Deaf & Dumb স্কুলের হেডমাষ্টার হইছে। এলায় ভোদাই ঠ্যাটা মালেক্যারে সামনে দিয়া জেনারেল পিঁয়াজী, জেনারেল ফরম্যান, জেনারেল রহিম, ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার আতা, রিয়ার এডমিয়াল শরীফ মাঠে নামছে।

লগে লগে ছল্লাৎ কইর‍্যা খালি আওয়াজ হইতাছে। মাঠ খুবই পিছলা কিনা-তাই ব্যাডারা খালি আছাড় খাইতাছে। আর মেজর সিদ্দিক সালেক সমানে Hand Out আর Press Note ছাড়তাছে। বিচ্ছুগুলার কারবারের খবর আইলেই 'হিন্দুস্তানীরা করছে ' কইতে হইবো। আইজ-কাইল আবার নয়া ভ্যাস ধরছে। Publicity দেওনের টাইমে কইতাছে ইন্ডিয়া আর বিচ্ছুরা মিইল্যা কারবার করতাছে। মছুয়াগুলা আখেরি দম ছাড়নের খবর আইলেই বাঙালি মাইয়া আর গেদা পোলা মারতাছে কইয়া বোগাচ Publicity দিতাছে। কিন্তুক কোনাডাই আর কামে আইতাছে না। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত রেডিও গায়েবী আওয়াজে খালি কাঁন্দাকাটির আওয়াজ। গেছি-গেছি, বিচ্ছুরা কোবাইয়া মারলোরে, কোবাইয়া মারলো। নোয়াখালী-ফেনী, কুমিল্লা-ময়নামতী, আখাউড়া-শালদিয়া ছাতক-সুনামগঞ্জ এলাকায় দিন কয়েক ধইর‍্যা বিচ্ছুগুলার গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। মছুয়াগুলার ভাগনের রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ। অনেক জায়গায় বিচ্ছুরা মছুয়াগো ঘেরাও দিয়া বইয়া আছে-দেখি দানাপানি ছাড়া কয়দিন চিরকিৎ রাখতে পারো।

এইদিককার কারবার হুনছেন নি? বিচ্ছুগুলা আইজ-কাইল 'দমাদম মস্ত কা লান্দর' কাম শুরু কইর‍্যা দিছে। এতো কইর‍্যা আংরেজ গো না করলাম বঙ্গালা মুলুকে ব্যবসা বাণিজ্যডা দুই চাইর মাস একটু ক্ষ্যান্ত দাও। নাঃ-তাগো চিরকিৎ হইছিল। 'সিটি অব সেন্ট আল্‌বানস' নামে আংরেজগো একটা জাহাজ হাঁটি হাঁটি পা- পা কইর‍্যা যেই চালনা বন্দরের কাছে গেছে, অমনেই শুরু হইলো গুম্ গুমা গুম। কি হইলো ? কী হইলো ? এই বন্দরের বগল দিয়া না মছুয়ারা আছিলো ? তা হইলে বিচ্ছুরা আইলো কই থাইক্যা ? ও মাই গড ! পোলাপানে তা' হইলে মছুয়া মাইর‍্যা সাবাড় করতাছে। এইডা ভিয়েতনাম থাইক্যাও ডেইনগারাস্। খবর নাই, পাতি নাই খালি কোবায়া যাইতাছে। এই না কইয়া আংরেজ জাহাজটা লেংড়াইতে লেংড়াইতে কোনো মতে কইলকাত্তার দিকে গ্যাছেগা।

অ্যাঃ অ্যাঃ। ঢাকা টাউনে বিচ্ছুগুলার কুফা কারবার সামনে চলতাছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজের একজন মছুয়া ইঞ্জিনিয়ার পটল তুলছে। বায়তুল মোকার্‌রমের সামনে বোমা মাইর‍্যা পাঁচজন দালাল হালাক হইছে। ঠ্যাটা মালেক্যায় ভয়ে অক্করে থর্ থর্ কইর‍্যা কাঁপতে শুরু করছে। গবর্ণমেন্ট পাবলিসিটির কবি আবুল হোসেন সা'ব, একটুক্ হিসাব কইর‍্যা চইলেন। আপনে যেমন লাগে আইজ- কাইল দৌড়াদৌড়ি বেশি করতাছেন।

... আরে এইটা কি ? এইটা কি ? আমাগো বকশি বাজারের নাড়ুয়া ছক্কু মিয়া কাঁদতাছে কীর লাইগ্যা? কী হইছে ? আমাগো ছক্কুরে মারলো কেডা ? পরনের তপন দিয়া নাক চোখের পানি মুইছ্যা ছক্কু কইলো,

'ভাই সা'ব, বিচ্চুরা এর মাইদ্দেই ঠ্যাটা মালেক্যার পেয়ারা আল সাম্‌স, আলবদররে কোবায়া তক্‌তা বানাইছে। মওলবী বাজারের কসাইরা যেমতে, কইর‍্যা খাসীর চাম খোলে, বিচ্চুরা সাম্‌স-বদরের হেইরকম কারবার কইরা ফেলাইছে। লাশের অক্করে পাহাড় হইয়া গেছে। আমি কইলাম 'আবে এই ছক্কু-কেইসডা একটুক খুইল্যা ক'। আমিতো আল সাম্‌স আর আলবদররে চিনতে পারলাম না। এইগুলা কি জিনিষ ?
ছক্কু গলার মইদ্দে একটা জোর খ্যাকরানি দিয়া কইলো, 'ভাইসা'ব আপনে অখনও আন্ধারের মাইদ্দে রইছেন। ঠ্যাটা মালেক্যায় রাজাকারগো ঠিক মতন ঠাহর করণের লাইগ্যা একেক জেলায় একেক নাম দিতাছে। সাম্‌স আর বদর হইতাছে জামাতে ইসলামীর ট্রেনিং দেওয়া রাজাকার কোম্পানির নাম। ঢাকার গর্ভণমেন্ট হাউসের বিলেক বোর্ডের মাইদ্দে এই সব নাম লেখা রইছে। বিচ্চুগুলার ঘষাঘষির কারবার হইলে চক দিয়া বোর্ডের মাইদ্দে লিইখ্যা থোয় ৮ই নভেম্বর আল-শাম্‌সের ২৬২ জন কইম্যা গেল। ৯ই নভেম্বর আল বদরের ১৯২ জন ছারেন্ডার করলো। পাবলিকেরে ভোগা মারনের লাইগ্যা রাজাকারগো ইসলামী নাম দিয়া গোলাম আজম-ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী কি খুশি ? কিন্তুক অখন বোর্ডের মাইদ্দে চক দিয়া লম্বর লেখতে লেখতে মওলবীসা'বগো হাত খড়ি মাটির গুড়ায় সাদা হইয়া গ্যাছে। অ্যাঃ অ্যাঃ ! চুষ-পাজামার জেলা সিলেটে হাসপাতালের মাইদ্দে জখমি মছুয়াগো আর জায়গা হইতাছে না। এইদিকে কুমিল্লা সেক্টরে বিচ্চুগুলা গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করতাছে। গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর, নদী-নালা হগ্‌গল জায়গায় হাজারে হাজারে বিচ্চু খালি মছুয়াগো ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে। পাইলেই মাইর, পাইলেই মাইর। চাইর দিকে আওয়াজ উঠছে 'জিন্না মিয়ার পাকিস্তান-আজিমপুরের গোরস্থান'। হের লাইগ্যাই কইছিলাম কেইসটা কি ? আল্লাহ্‌র মাইর দুনিয়ার বাইর।
ছেরাবেরা। অক্করে ছেরাবেরা। বঙ্গাল মুলুকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গ্যাছে। এক রামে রক্ষা নাই, সুগ্রিব দোসর। হাজারে হাজার বাঙালি বিচ্চুগো গাবুর মাইরের চোটে যখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগো হালুয়া অক্করে টাইট্‌ হয়া গ্যাছে, ঠিক হেই টাইমে মিত্র বাহিনী আইস্যা, আরে মাইর রে মাইর ! ওয়াল্ড-এর বেষ্ট মছুয়া এয়ার ফোর্স পয়লা দিনা দুই কুচকাচ্‌ কইর‍্যা অক্করে জমিনের মাইদ্দে হমান হয়া গ্যাছে। এ্যার মাইদ্দে আবার বিচ্চুগো এয়ার ফোর্স চিটাগাং, ভৈরব আর নারায়ণগঞ্জের মাইদ্দে কড়া কিছিমের কারবার কইর‍্যা হানাদার সোলজারগো মেরামত করছে।

আত্‌কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ভাইসা'ব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা ! কী লজ্জা ! মাথাডা এ্যাংগেল কইর‍্যা

তেরছী নজর মারতেই দেহীকী, শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ-মানে দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর জিগাইলো, 'তুম লোগ্‌কো কাপড়া কিধার গিয়া ?' জবাব আইলো-যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডার ওয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি -'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া ? -হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া।'

কি পোলারে বাঘে খাইলো ? শ্যাষ। আইজ থাইখ্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ। ঠাস্ কইয়্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো ? কি হইলো ? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলো। আট হাজার আষ্টশ' চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচী- লাহুর পিন্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল, আইজ তার 'খতম তারাবী' হইয়া গেল।

বাঙ্গালী পোলাপান বিচ্চুরা দুইশ পয়ষট্টি দিন ধইর্‌য়া বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে World -এর Best পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি। ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা ঘঁৎ ঘঁৎ কইরা দম ফ্যালাইলো। 'ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ।' আত্‌কা আমাগো চক বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ পাইড়্যা উডলো, 'ভাইসা'ব, আমগো চক বাজারের চৌ-রাস্তার মাইদ্দে পাথর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইদ্দে কাউলারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোট্‌পাট্ বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বাঙ্গালি বিচ্চু হেগো চুটিয়া-মানে কিনা পিঁপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিল। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইদ্দে লিইখ্যা থুইছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তবে।' টিক্কা-মালেক্যা গেল তল, পিঁয়াজ বলে কত জল ?

... সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যখন আন্তাজ করতে পারলো যে, কোনো ট্রিক্‌সেই আর কাম হইতাছে না, তখন পাকিস্তান আর বঙ্গাল মুলুকের লাড়াইডারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের গেনজম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ভট্ কইর্‌য়া কইয়্যা বইলো, 'আমি কিন্তু আর নিজেরে আটকাইয়া রাখতে পারতেছি না, আমার লগে নতুন মামু রইছে, বুড়া চাচা রইছে। আমি ইন্ডিয়া Attack করমু।' দিনা দশেকের মাইদ্দে আমি এই কারবার করমু। এইবার আমি নিজেই পিন্ডির থনে বর্ডারে যামুগা। যেই কাথা, হেই কাম। মাথার Upper Chamber খালি ছদর ইয়াহিয়া -যা থাকে ডুঙ্গির কপালে কইয়া কারবার কইর্‌য়া বইলো। কিন্তু মওলবী সা'বরে আর Border এ যাইতে হইলো না।

আত্‌কা শরাবন তহুরার গিলাস টেবিলের উপর ঠকক্কইরা থুইয়া দ্যাহে কী ? লাড়াই রাওয়ালপিন্ডির দরজায় আইস্যা হাজির হইছে। পাশে আজরাইল ফেরেশ্‌তা খাতা হাতে খাড়াইয়া রইছে। খাতায় লেখা সাদাপাকা মোটা মোটা ভুরু-ওয়ালা আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পিতা Unknown.

এইদিকার খবর হুনছেন নি ? সবই হবুর কারবার। হবু পেরধান মন্ত্রী চুরুল আমীন, হবু দেশরক্ষা মন্ত্রী মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা, হবু যোগাযোগ মন্ত্রী আগায় খান পাছায় খান খান আব্দুল কাইয়ুম খান, হবু পোষ্টাপিসের মন্ত্রী ইসলামের যম গোলাম আজম আর হবু ফরিন মিনিস্টার মদারু ভুট্টো। কেউই শপথ লইতে পারে নাইকা-টাইম শর্ট। বঙ্গাল মুলুকের বিচ্চুগো গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। ঠ্যাটা ম্যালেক্যার কী কাঁপন ! মওলবী সা'বে বাংকারের মাইদ্দে বইস্যা বল পয়েন্ট কলম দিয়া গবর্ণরের পদ থাইক্যা ইস্তফা দিছে। এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। বেডায় তার স্যাঙ্গাৎগো লইয়া কী সোন্দর হোটেল Intercontinenral এর মাইদ্দে হান্দাইছে। কিন্তু মওলবী সা'ব বহুত লেইট কইর‍্যা ফেলাইছে। আপনার ঘেটুগো খবর কি ? ছহি আজাদ পত্রিকার হরলিক্সের বোতল ছৈয়দ ছাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন, ছালাউদ্দিন মোহাম্মদ, সংগ্রাম পত্রিকার মাওলানা আখতার ফারুক্যা, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহম্মদ আশ্‌ক, পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসির গুর্দার শুরুয়া খাওইয়্যা মাহবুবুল হাক, নেশন্যাল ব্যুরোর দাঁড়ি নাই মাওলানা ডাঃ হাসান জামান, খোন্দকার আবুল হামিদ এসব মালেরা অখন কি করবো ? প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হাক চৌধুরীর কোনো খবর নাইক্যা-সিলেটের হারু মাল চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর কোনো আও-শব্দ পাওয়া যাইতাছে না। কি হইলো ? এদ্দিন তো শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আর দরদী সংঘের দালাল সম্রাট এ. টি. সাদ'দীরে লইয়া খুবই তো ফাল্‌ পাড়াতাছিলা-মাল-পানি জিন্দাবাদ। এলায় হের করবা কি ?

আমার সাজানো বাগান হুকায়া গেল। অ্যাঃ এ্যাঃ একটিং জাতিসংঘে মদারু ভুট্টো জেনারেল পিঁয়াজীর ছারেন্ডারের খবর পাইয়া একটিং করছে। পয়লা গরম, তারপর নরম, হেরপর আরে কান্দনরে কান্দন ! পকেটের রুমাল বাইর কইর‍্যা চোখ মুইচ্ছ্যা নাক Clear কইরা লইলো। চিল্লাইয়া কইলো, 'ছারেন্ডার-ছারেন্ডার তো Impos –অসম্ভব। আমরা ছারেন্ডার করমু না। আমি পাইট করমু, আমি পাইট করমু।' এই না কইয়া মদারু মহারাজ আত্‌কা গতরের জামাকাপড় থুড়ি-ফ্রান্স-বৃটেনের খসড়া প্রস্তাব টুকরা টুকরা কইর‍্যা ছিইড়্যা ফেলাইয়া ঘেট্‌মেট কইর‍্যা বাইরাইয়া গেল। বাইরাইনের টাইমে ইন্ডিয়া-রাশিয়ার লগে ফ্রান্স-বৃটেনেরে তুফান গাইল। সাদা চামড়ার জেন্টেলম্যানরা খালি কইলো, 'যার লাইগ্যা চুরি করি, হেই কয় চুর।'

জাতিসংঘ থাইক্যা আগাশাহীর রুমে আহনের লগে লগে মওলবী সা'ব খবর পাইলো, 'খেইল খতম, পয়সা হজম।' আট হাজার আষ্টশ চুরাশী দিনের সোনার হাঁস, মানে কিনা বঙ্গাল মুলুকসহ পাকিস্তান নামে দেশটা শ্যাষ হইয়া গেছে। আমগো ছক্কু মিয়া একটা গুয়ামরি হাসি দিয়া গালটার মাইদ্দে খ্যাকরানি মারলো। কইলো, 'ভাই সা'ব ২৬শে মার্চ এই মদারু ভুট্টো ঢাকার থনে করাচীতে ভাগোয়াট্ হইয়া এলান করছিল,'আল্লায় সারাইছে, ছদর ইয়াহিয়া বেশুমার বাঙ্গালি মার্ডারের অর্ডার দেওনের গতিকে পাকিস্তানডা বাঁইচ্যা গেল।

এলায় কেমন বুঝতাছেন ? বিচ্চুগো বাড়ির চোটে হেই পাকিস্তান কেমতে কইর‍্যা ফাঁকিস্তান হইয়া গেল ? হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, কি পোলারে বাঘে খাইলো ? শ্যাষ। অইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ।

আইজ ১৬ই ডিসেম্বর। চরমপত্রের শ্যাষের দিন। আপনাগো বান্দার নামটা কইয়া যাই। বান্দার নাম এম আর আখতার মুকুল।

আমাদেরকে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, এবং বাংলাদেশের ভিতরে-বাইরে কোটি কোটি বাঙালিকে যা সবচে'বেশি উজ্জিবীত করতো, উতালা করত, মনোবল জাগাত, আগুনের মতো তাঁতিয়ে তুলত এবং স্বদেশ ভূমিকে শক্র-মুক্ত করার অদম্য সাহস ও প্রেরনা জোগাত তা হল **"বজ্র কন্ঠ"**। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ দু'টো শব্দ ভেসে আসত 'বজ্র কণ্ঠ' ! পরমুহুর্তেই ক্ষনিকের জন্য ঝন ঝনাত ধরনের এক রকম রনবাদ্য বেজে উঠত এবং জলদগম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন ভাষন ও স্বাক্ষাতকারের ছোট ছোট অংশ। বজ্রকণ্ঠের সময় অনেককে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে, দাঁত কড়মড় করতে, মাঠে বসা অবস্থায় মাটিতে জোরেশোরে বেদম কিল মারতে এবং অতি উত্তেজনায় 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে গলা ফাটাতে দেখেছি। বজ্রকণ্ঠ আমাদেরকে যেন Electricuted করত। পরবর্তীতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, বাংকারে বসে যখন ভরাট গলার 'বজ্রকণ্ঠ' শুনতাম, রক্তে আগুন ধরে যেতো। মনে হতো, এটিই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত দিক নির্দেশনা ও প্রকৃত কম্যান্ড। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আর বজ্রকণ্ঠের ইতিহাস এক ও অবিভাজ্য। মন চাইতো লাফিয়ে উঠে তখনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে। চরমভাবে উত্তেজক ও উদ্দীপক 'বজ্রকণ্ঠের' দু'একটি নমুনা :

১। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় ;

২। ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মূমূর্ষ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস - এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

৩। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনি তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

৪। কী পেলাম আমরা ? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।

৫। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয় - তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে 'শত্রুর' মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি - তোমরা বন্ধ করে দেবে।

৬। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। - - - সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবেনা।

৭। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

৮। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

জ. **প্রতিবেশী ভারতীয়দের উদারতা ও সহৃদয়তা :** আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি পালাটানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও মাঠে স্থাপিত। অনিবার্য কারণেই স্কুলটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পালাটানা এলাকার শিশুদের পড়াশুনা বন্ধ। নির্দিধায় বলা যায় যে, এটি ছিলো আমাদের জন্য এ অঞ্চলের ভারতীয়দের এক.টি বড় রকমের ত্যাগ। এ প্রসঙ্গে আরো দু'টো কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হবে সে ব্যাপারে তখনো পর্যন্ত কারো কোনো ধারণাই ছিল না। স্বাধীনতার জন্য একটা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম। শত্রু-মুক্ত করে দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমাদের বছরের পর বছর, এমনকি ১০/১৫ বছরও লেগে যেতে পারে এভাবেই প্রশিক্ষনকালীন সময়ে আমাদেরকে বলা হচ্ছিল। ভারতীয়রাও তাই মনে করত। সূতরাং ঐ অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমাদেরকে সাদরে বরণ করা, আশ্রয় দেয়া, আমাদের প্রশিক্ষনের জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে বাচ্চাদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া নিশ্চয়ই অনেক বড় মানসিকতা ও উদারতা ছাড়াও এটি ছিল একটি বড় রকমের উৎসর্গ ও ত্যাগ। দ্বিতীয়ত সমগ্র ভারতে এরকম হাজার হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং ও লক্ষ লক্ষ শরনার্থীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে

যে, যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচার, নির্যাতন এবং জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রমের অনি চয়তার কারণে প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো। থাকার আশ্রয় ছাড়াও এদের প্রায় সকলের জন্যই রেশনের মাধ্যমে চাল-ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হত। এসবের জন্য ভারত সরকার এবং ভারতের জনগনের কী পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছিল তার মোটামুটি একটা হিসাব হয়তো বের করা যাবে। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতের কী পরিমান ক্ষতি হচ্ছিল তা ছিল হিসেব-নিকেশের অনেক উর্ধে।

ফিরে আসি পালাটানায়। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে, বিশেষ করে আসাম ও ত্রিপুরায় কাঁঠাল ও চিনি-চম্পা কলা বেজায় সস্তা। ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি এবং টাকা-পয়সার অভাবের কারণে এক কোঁস কাঠাল খাওয়ার ভাগ্যও আমাদের ছিলনা। অথচ ক্যাম্পে বসেই আমরা আশে পাশে থাকা গাছ-পাঁকা কাঁঠালের মো-মো সুগন্ধ অনুভব করতাম। অনেককে এ ব্যাপারে আফসোস করতেও শুনেছি। কাঠালের সম্মন্ধীয় ব্যাপারে ছেলেদের এ আফসোস, অতৃপ্তি ও হাহাকারের কথা কীভাবে জানি বাইরে জানাজানি হয়ে গেল। এ-কান সে-কান হতে হতে ছোট্ট বিষয়টি পূরা এলাকায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত একদিন সকালে এলাকার প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকেই ক্যাম্পের গেটে কাঠাল পাঠান শুরু হল। এ ব্যাপারে প্রচার ও সমন্বয়ের দায়ীত্ব পালন করল স্থানীয় যুবকগন। কাঠালের স্তুপ বাড়তে বাড়তে তা ছোট-খাটো একটি পাহাড়ের রূপ নিলো। এলাকার জনগনের আন্তরিক অনুরোধে এবং ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের অনুমতি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীকেই একটি করে কাঁঠাল প্রদান করা হল। অপর্যাপ্ত খাবার ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে ছেলেদের শরীর-মন প্রায় শুস্ক হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরে একবারের তরেও ফল-মূল ও দুধ-মিষ্টি খাওয়া হয়নি তাদের। সূতরাং উপহার হিসেবে পাওয়া সুমিষ্ট ও রসালো সেই কাঁঠাল আমরা খেলাম পেট পুরে ও প্রাণ ভরে। সে-যে কী তৃপ্তিদায়ক এক ব্যাপার ছিল তা আজ আর কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তৃপ্তিতে, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গিয়েছিল।

ঝ. **বানরের বাঁদরামী !** ট্রেনিং শেষে, যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাহাড় বেষ্টিত এক গভীর অরন্যে। সেখানে আমরা রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি ও ষ্টেন গান দিয়ে গুলি করে এবং গ্রেনেড ছুড়ে অস্ত্র চালনার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। তবে ট্রেনিং সেন্টার থেকে জঙ্গলের মধ্যে ফায়ারিং রেঞ্জ এ যাত্রার এক পর্যায়ে আমরা যখন ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখনই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা।

আমরা 'সিংগেল লাইনে' এগুচ্ছিলাম। চারদিকে ছোট-বড় হরেক রকম গাছের ঘন অরন্য। গাছের ঘনত্ব এত বেশি ছিল যে সুর্যের আলো পূরোপুরি দেখা যাচ্ছিল না। বিরাজ করছিলো এক ধরনের আলো-আঁধারের পরিবেশ।

ঝরা পাতার উপর দিয়ে হাঁটার সময় মুচ-মুচ ধরনের এক প্রকার শব্দ হাচ্ছিল। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল নাম-না-জানা অসংখ্য পাখির কুজন এবং কখনো-কখনো পলায়নপর ভীত-সন্ত্রস্থ পাখিকুলের ডানার আওয়াজ ও ভয়-পাওয়া ডাক। কাঠবেড়ালীর সংখ্যা প্রচুর। ধূসর রং এর কাঠরেড়ালী ছাড়াও বিভিন্ন রং ও বর্ণের বিরল প্রজাতীর কাঠবেড়ালী ছিল দেখার মত।

২/৩ কিলোমিটার গভীরে যাওয়ার পরই ঘটলো অভূতপূর্ব ও অদ্ভুত সে ঘটনা। পদ-যাত্রার এ পর্যায়ে চলার পথে দেখা গেল ৬/৭টি বানর, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। যতই চলতে লাগলাম ততই তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বানরদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের ডানে, বাঁয়ে ও সামনে দিয়ে আমাদের মতো একই গতিতে হেঁটে এগিয়ে চলছে। বানরদের আরেকটি অংশ আমাদের মাথার উপর দিয়ে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে এবং এক ডাল থেকে আরেক ডালে অবলিলাক্রমে ও নিপুনভাবে তারা লাফ দিয়ে দিয়ে এগুতে লাগল। গাছ খেকে থেকে গাছে এবং ঝুলন্ত ডাল থেকে ডালে তাদের চলার গতি এতো অবাধ ও নিখুঁত ছিল যে তা আমাদেরকে সত্যিই অবাক করল। এক পর্যায়ে আমাদের মনে হল যে সামনে, ডানে, বাঁয়ে এবং উপর দিয়ে বানরেরা যেন আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষন পর কিচির-মিচির শব্দ করে তারা হঠাৎ অতি দ্রুত গতিতে সামনের দিকে চলে গেল। কেন এভাবে তারা চলে গেল ? কে জানে ! বানরের কান্ড-কারখানা এবং হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা একই গতিতে এগিয়ে চলেছি। প্রকৃতি নীরব ও প্রশান্ত। মিনিট চল্লিশেক পর হঠাৎ ডান, বাম ও উপরের গাছে আবার দেখা গেল অসংখ্য-অগনিত বানর। আগের তুলনায় এখানে এদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। দাঁত বের করে খেক-খেক করে হাসছে আর দুহাত দিয়ে একযোগে করতালি দিচ্ছে তারা। কিছু বানর আবার গাছের পাতা ছিঁড়ে আলতোভাবে নিচের দিকে ছেড়ে দিচ্ছে। ছেঁড়া পাতা আমাদের মাথায় ও শরীরে এসে পড়ছে। বিষয়টি আজো আমাকে ভাবিয়ে তোলে। এ কি শুধুই বানরের বাঁদরামী ছিল ? মনে পড়ে, ব্যক্তিগতভাবে সেই সময় আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও পুলকিত বোধ করেছিলাম। বানরকুল অবশ্য আর অগ্রসর হয়নি। আমাদের চলার গতি ছিল অবিচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন। এক সময় আমরা পৌছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল--ফায়ারিং রেঞ্জ এ। কিন্তু ভূলতে পারছিলামনা বানরকুলের অপ্রত্যাশিত ও অব্যখ্যাত বন্ধুসুলভ আচরনের অনন্যসাধারন এ বিষয়টি।

ঞ. **মাগার কোন শালা পায়দা কিয়া !** আবহাওয়া যেদিন ভাল থাকতো সেদিন খাওয়া-দাওয়া এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা শোনার পরও আমরা মাঠে বসে আড্ডা দিতাম, সুখ-দুঃখের গল্প করতাম। ফেলে আসা স্বদেশ ভূমি এবং মা-বাবা-ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধবদের কথা, যুদ্ধ-যাত্রার জন্য

প্রবাসে কঠোর-কঠীন সামরিক প্রশিক্ষণের কথা, দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত এলাকায় চলমান যুদ্ধের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা, হানাদার বাহিনীকে না মেরে কীভাবে ধরে প্যাঁদানো দেয়া যায় এবং সর্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতার কথা আলাপে উঠে আসত। পরিবেশ যখন ভারী হয়ে উঠতো, মন যখন খারাপ হয়ে যেতো তখন কেউ কেউ এগিয়ে আসত তাদের রসালো কেচ্ছা-কাহিনী-গল্প ও কৌতুকের ডালি নিয়ে। সবাই মিলে খুব হাসতাম। আমোদজনক একটা পরিবেশ তৈরি হত। প্রফুল্ল মন নিয়ে ঘুমোতে যেতাম।

যারা রসাত্মক গল্প এবং দম-ফাটানো হাসির কৌতুক পরিবেশন করত, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল হাদী। ২২/২৩ বছরের হাদী পেশায় ছিলো একজন ফেরিওয়ালা। গ্রাম-গঞ্জের হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে সে বিক্রি করত বাতের বড়ি ও চির-ক্রিমির ঔষধ। হাটের দৃশ্যের মত হাদীকে মাঝখানে রেখে আমরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াতাম, আর হাদী দারুন রসিকতা ও দক্ষতার সাথে বাতের বড়ি ও কৃমির ঔষধ বিক্রির অভিনয় করত। আমরা তা দারুনভাবে উপভোগ করতাম। কৃত্রিমভাবে পেট ফুলিয়ে সে যখন ক্রিমির ঔষধের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা বর্ণনা করত তখন আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। বুড়োদের গেঁটে বাত, আম বাত, শির বাত সহ হরেক রকম বাতের অসুখের মহৌষধ হিসেবে বটিকাগুলো বিক্রি করার সময় বাতের ব্যথায় মুখ বিকৃত করে সে যখন কঁকিয়ে উঠত তখন আমরা কি যে মজা পেতাম তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। হাদীর কণ্ঠ এবং কণ্ঠের উচ্চারন, ছন্দ, তাল ও লয় ছিল অপূর্ব। অর্ধ-শিক্ষিত এ ছেলেটি এল্যুমিনিয়ামের খাওয়ার প্লেট উপুড় করে তার উপরে হাতের দশ আংগুল দিয়ে তবলার খই ফুটিয়ে যখন একটার পর একটা গান গাইত, তখন আমরা তন্ময় হয়ে তা উপভোগ করতাম। রবীন্দ্র, নজরুল, পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, আধুনিক, জারী গান, সারী গান-- সব গানই সে গাইতো। যেন তালিমপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত একজন পেশাদার গুনী শিল্পী।

এক জোৎস্নালোকিত মনোরম সন্ধ্যায় আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। খবরে বলা হচ্ছিল, পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী কর্তৃক মা-বোন-স্ত্রীদের নির্মম ও হৃদয়বিদারক ধর্ষনের কথা। এ জানোয়াররা কোনো কোনো অঞ্চলে এমনকি বৃদ্ধা ও শিশুদেরকেও রেহাই দিচ্ছে না। হাদী নিরবে উঠে চলে গেলো তার ব্যারাকে। বসে গেলো কাগজ-কলম নিয়ে। লিখে ফেলল একটি কাওয়ালী। পরবর্তী ৩ দিন মাঠের এক কোনে ৬/৭ জন সাথী নিয়ে চললো তার রচিত কাওয়ালীর সূর সৃজন, তালিম ও রিহার্স্যাল। চতুর্থ দিন 'কাওয়াল' হাদী তার দল বল নিয়ে থালার তবলা সহ বসে পড়ল মাঠের মাঝখানে। স্বরচিত কাওয়ালী শোনাবে সে। প্রথমে আ-আ-আ-আ-করে২/৩ মিনিট গলা সাধল। তারপর মিনিট খানেক গলা সাধার পর শুরু হলো তার

এবং তার দলের কাওয়ালী। কী গলা ! কী গাওয়ার ঢং ! পরিবেশনার কী মুনশীয়ানা ! এক কথায় অসাধারন। অপূর্ব। কাওয়ালীর প্রথম দু'একটি লাইন আজো আমার মনে পড়ে :

হাদীতো শাদী কারকে বিদেশ মে আ-গিয়া
ইধার খবর আয়া
মেরা এক লেড়কী পায়দা হো-গিয়া।
মাগার কোন শালা পায়দা কিয়া !
তেল্যা চোরামে খালিয়া-হ্যায়
তেল্যা চোরামে খালিয়া !
হায়,
তেল্যা চোরামে খালিয়া হায়, তেল্যা চোরামে খালিয়া !

'তেল্যা চোরামে খালিয়া হায়' বলতে বলতে হাদী ও তার দল তবলা এবং হাত-তালি বাদ দিয়ে ডান হাত দিয়ে আলতো করে বাম বুকে থাবড়াতে লাগল। এতে বুকের উপরকার সমবেত আওয়াজের আবেদন আর কাওয়ালীর বানীর মর্মকথা মিলে একটি উপভোগ্য, কিন্তু করুণ ও বিষন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এক সময় কাওয়ালী শেষ হল। কিন্তু হতবাক হয়ে আমরা দেখলাম, হাদীর দু'চোখে অশ্রুর বন্যা !

ট্রেনিং শেষে হাদীকে আমার কোম্পানিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তাকে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ' সি' কোম্পানিতে নায়েব সুবাদার সেকান্দর সাহেব এর অধীনে ন্যস্ত করা হল। মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির পরে স্বাধীন বাংলাদেশে পূনর্গঠিত ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাদী রয়ে গেলো। যতদূর শুনেছি পরবর্তীতে সুবাদার হিসেবে হাদী আর্মি থেকে অবসর নিয়েছে। জানিনা গুনী ও স্পর্শকাতর হৃদয়ের শিল্পী, কঠিন, অবিচল ও দূর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা হাদী সহ অন্য প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু ও সহযোদ্ধাগন আজ কোথায় !

**গোলাম মুস্তাফা**

জন্ম ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ফেনী। শিক্ষা আলী আজম হাই স্কুল, ফেনী (১৯৬৮)। ১৯৭০ সালে ফেনী কলেজ থেকে এইচএসসি। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ মাস্টার্স। গর্বিত রোটারিয়ান গোলাম মুস্তফা মানুষকে ভালোবেসে সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট। ২০১৩-২০১৪ সালের জন্য তিনি বেটারি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাচিত গভর্নর।

একাত্তরে গোলাম মুস্তফা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সাথে গণযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেন। কমান্ডিং অফিসারের স্টাফ অফিসার ও পাইওনিয়ার প্লাটুনে একাংশের কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

# পথচলার পথ

## মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

পরিসংখ্যান ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিসংখ্যান নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সত্যের সঙ্গে কিছু যোগ করলে সত্য থেকে বিয়োগই করা হয়। সে অর্থে সত্য গোপন করাও ইতিহাস রচনায় অমার্জনীয় অপরাধ। আমাদের অহংকারের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে অসত্য মিশ্রিত হয়ে একরকম লেজে গোরবে মিশে গেছে। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, বর্বরতা আর নির্মমতা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার প্রয়াসও হয়েছিল। আশার কথা সে অবস্থার উত্তরণ ঘটেছে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলো তাদের সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা, যুদ্ধসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি, ভুলভ্রান্তি এবং ব্যর্থতাসমূহ আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক গ্লানি এড়ানোর জন্য তাদের জনগণ এবং বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, কত কম ক্ষতিতে তারা কত বেশি অর্জন করেছে অথবা তাদের পরাজয় কেন অনিবার্য ছিল। যুদ্ধের এই এক বেসাতি। এ প্রসঙ্গে লে. জে. জেএফআর জ্যাকবের Surrender at Dacca- Birth of a Nation-এর (University Press Ltd., Dhaka, 1997, P. 9) ভূমিকার কিয়দাংশ পড়া যেতে পারে। একাত্তরের ডিসেম্বরের ভারতীয়দের যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি লেখেন— Some twenty five years have since elapsed but so far no authoritative or objective account is available. An official history has been prepared but is yet to be published; in any case its authors were not given access to sensative documents. Their work will, as in the current practice, be subjected to editing by the Defence, Home and External Affairs Ministries, and will by and large canform to the official version of everts. Since the Henderson Brooks Report on the 1962 operations and the history of the 1965 operations have yet to be published it is more than likely that the account of the day for quite some time yet.

এই বিবেচনায় আমাদের তথ্যপ্রকাশ ছিল ভিন্নধর্মী ও বিপরীত। এটা স্বাভাবিক। যেভাবে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। মানুষ এবং পশুর মধ্যে তফাত খুবই সামান্য। একাত্তরে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে সে

তফাতটুকুও ঘুচিয়ে ফেলেছিল। মানুষ হত্যা করা যায়; কিন্তু মানুষের বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না— এ সামান্য ধারণাটুকুও তাদের ছিল না। আজ সত্যিই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত কীভাবে আমরা তাদের সঙ্গে সহঅবস্থান করেছিলাম।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বিশাল ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যে অসহায়ত্বের মধ্যে দেশবাসী ছিল সেখানে বিদেশী সাহায্য ও সহানুভূতি ছিল সীমাহীন গুরুত্বের। সে কারণে প্রাণহানি, সম্ভ্রমহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে বলতেই হয়েছিল। আজ স্বাধীনতার চার দশক পর যখন ইতিহাস লেখা হচ্ছে তখন আর সেই পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করা যায় না, সমীচীনও নয়। এখন সত্য উদ্ঘাটন অত্যাবশ্যক। একাত্তরে সাড়ে সাত কোটি লোকসংখ্যা ছিল। এ সংখ্যাকে ৩০,০০,০০০ শহীদদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল আসে ২৫। তার অর্থ গড়ে প্রতি ২৫ জনে একজন করে নিহত হয়েছিল পাকিস্তানিদের হাতে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। একাত্তরের ২৫শে মার্চ এবং ১৬ই ডিসেম্বর অন্তর্ভুক্ত করলে মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ছিল ২৬৭ দিন। ৩০,০০,০০০কে ২৬৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল দাঁড়ায় ১১,২৩৫। তার অর্থ প্রতিদিন গড়ে পাকিস্তানিরা ১১,২৩৫ জন বাঙালি বাংলাদেশে হত্যা করেছিল। এ সংখ্যাও বিশ্বসযোগ্য নয়। যারা ৩০,০০,০০০ শহীদ বলেন সংখ্যাটি প্রমাণ করার দায় তাদের। তাদের এটাও প্রমান করতে হবে শহীদের সংখ্যা ৪০,০০,০০০ বা ২০,০০,০০০ নয় কেন। ৩,০০,০০০ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বেলায়ও এ কথা সত্য। যথেষ্ট দেরি হলেও এ পরিসংখ্যানগুলি সঠিক করার সময় শেষ হয়ে যায়নি। কেউই চাই না অসত্যের ওপর আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের ভিত বচিত হোক। আমরা ৩০,০০,০০০ শহীদ বললেও পৃথিবীর কোনো ইতিহাস বইতে এ সংখ্যা সমর্থিত হয়নি।

(একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্রিয়া বর্তমানে চলছে। কাজেই কেউ কেউ এ লেখার উদ্দেশ্য ও মর্মবার্তা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন। আদতে ভুল আমাদেরই। তারা যেভাবে নির্বিচারে গণহত্যা আর বর্বরতা চালিয়েছিল সে প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত ছিল প্রকাশ্যে। ইতর সে তো ইতরই আপকে বাঁচিয়ে রেখে অর্বাচিনের কাজ করা হয়েছে।)

মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুজনিত কারণে যেখানে এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমার কথা সেখানে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ বড় কষ্টের। স্বাধীনতা উত্তরকালে যাদের জন্ম তারাও রাজনীতির মই বেয়ে মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লিখিয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিতর্কিত ভোটার সংখ্যার সমস্যার ইতি টেনেছিল সঠিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে। কোনো রাজনৈতিক দল প্রশ্ন তোলেনি। মুক্তিযোদ্ধা যাচাইয়ের কাজটিও তাদের দেয়া যেতে পারত এবং এখনো দেয়া যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর জন্ম নেয়া বহু যুদ্ধশিশু (war baby) জন্ম নিয়েছে। কানাডা, স্ক্যান্ডানেভিয়ান দেশসমূহ, জার্মানি, জাপানসহ বহু দেশ থেকে বিভিন্ন জন এ শিশুদের

দত্তক নিয়ে গেছে। এ সবের কোনো তথ্য নেই সরকারের কাছে। কাগজপত্র কোথায় যাবে? আমাদের মনোযোগী হওয়ার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রাজাকারদের তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমান জারি করেছিল তাদের বিপদ ঠিকানাসহ। সে তালিকা প্রকাশিত হলে আমাদের শত্রু-মিত্র চিনতে সহজ হত।

যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধী (পাকিস্তানি) নিয়ে এখন নতুন কথা শুনছি। গত ১১ই ডিসেম্বর ২০১০ সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের চেয়ারম্যান এবং পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খন্দকার, বীর উত্তম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ফোরামের জাতীয় কনভেনশনে বক্তৃতায় বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন অফিসার যাদের বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করতে চায়। পাকিস্তান বলেছিল সে বিচার তারা করবে পাকিস্তানে। এ কথা শুনতে আমাদের চার দশক কেন লাগল? ২রা জুলাই ১৯৭২ মধ্যরাত ১২:৪০ মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে ভারতের সিমলায় পাকিস্তানি ৯১,৫৪৯ যুদ্ধবন্দি দেশে ফেরার চুক্তি হয় যা Simla Agreement নামে খ্যাত। সে চুক্তিতে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে এ বক্তব্যের ভিত্তি কী?

না এগুলে পিছিয়ে পড়বো। আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে অসত্য বলার দোষে দুষ্ট হতে চাই না। আর তাছাড়া যা গৌরবের, যা অহংকারের তার মধ্যে অসত্য থাকবে কেন?

এ লেখা লিখছি স্বাধীনতার চার দশক পরে। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে। স্বাধীনতা উত্তরকালে কয়েকটি গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। এর মধ্যে সামরিক সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দেশ শাসন করেছে। ইতিহাসমুখী পরিসংখ্যান সংগ্রহের এ উদ্দ্যোগ কেউই নেননি। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ এবং বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির ব্যানারে দেশের সব ইতিহাসবেত্তারা সংগঠিত। ইতিহাস চর্চার আদর্শ দুই সংগঠন। তাদের কাছে আমাদের কিছু প্রত্যাশা তো থাকতেই পারে। এটা জণযুদ্ধ এবং তার সফল ও বিজয়দীপ্ত পরিসমাপ্তিতা কি এ জাতির কাছে এতই তুচ্ছ?

মুক্তিযুদ্ধের তথ্যানুসন্ধান এবং উপাত্ত সংগ্রহে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সময় অনেক চলে গেছে কিন্তু সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রিয় উদ্দ্যোগ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। অপেক্ষা করতে করতে বেলা ডোবার সময় হয়ে যাচ্ছে। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শেষ হবার পূর্বেই স্মৃতি হয়ে যাব।

একাত্তরে দেশকে ভালোবেসে, দেশের প্রতি সমত্ববোধের কারণে অকাতরে কানাকড়ির দামে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল এ দেশের ভূমিসংলগ্ন মানুষ, সে কৃত্যের কাহিনী লিখে রেখে পৌত্র-প্রপৌত্রদের পথচলার পথ দেখিয়ে যাব। এ আমাদের অমরণ অংগীকার।

## মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা

| শ্রেণীবিন্যাস | সেনাবাহিনী | নৌবাহিনী | বিমানবাহিনী | পুলিশ | বাংলাদেশের রাইফেলস | আনসার ও মুজাজিদ | গণযোদ্ধা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অফিসার | ৮৪ | | ৪৪ | ৫ | | | |
| জুনিয়র কমিশনার অফিসার এবং অন্যান্য পদবীর সৈনিক | ৭,০০০ | ৫৯ | ৭২৯ | ১২,৬৯৮ | ১২,০০০ | ৩,৫০০ | |
| গণযোদ্ধা | | | | | | | ৮৩,৮৮১ |
| | ৭,০৮৪ | ৫৯ | ৭৭৩ | ১২,৭০৩ | ১২,০০০ | ৩,৫০০ | ৮৩,৮৮১ |
| সর্ব মোট = ১,২০,০০০ | | | | | | | |

নোট : ১. পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সদস্যদের আলাদা কোনো তালিকা নেই। স্বাধীনতার পর যেসব মুক্তিযোদ্ধা বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছাড়াও অন্যান্য রেজিমেন্ট, ব্যাটালিয়ন, এস্টাবলিসমেন্ট, হেডকোয়ার্টার থেকে যোগ দেয়া।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বমোট সংখ্যা ১,২০,০০০ (যুক্তিনির্ভর অনুমান)।

৪. যেসব গণযোদ্ধারা বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বা ভারতীয় বাহিনী দ্বারা ভারতে প্রশিক্ষকপ্রাপ্ত তাদেরই কেবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## বাংলাদেশের শহীদ ও ভারত এবং পাকিস্তানের নিহত সৈনিক

| | বাংলাদেশ | ভারত[১] | পাকিস্তান[২] | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| অফিসার | ৫১ | ৬৮ | ২৩৭ | পাকিস্তানিদের নিহদের সংখ্যা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের। অর্থাৎ শুধুমাত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে মোট ৩,০৩২ জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা অনেক বেশি। |
| জুনিয়র কমিশনড অফিসার | ৮৫ (১ জন ধর্মীয় শিক্ষকসহ) | ৬০ | ১৩৬ | |
| অন্যান্য পদবীর সৈনিক | ১৫৩৪ | ১২৯০ | ৩৫৫৯ | |
| বাংলাদেশ রাইফেলস | ৮১৭ | | | |
| বাংলাদেশ পুলিশ | ৭১৮ (৫ জন অফিসারসহ) | | | |
| নৌবাহিনী (বাংলাদেশ) | ২১ | | | |
| বিমানবাহিনী (বাংলাদেশ) | ৪৬ (১ জন অফিসারসহ) | | | |
| বাংলাদেশ আনসার | ৬১৪ | | | |
| খোঁজ নেই (বিশ্বাস করা হয় মৃত) | | ৫৬ | | |
| নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ | ৩০,০০০,০০ (আনুমানিক) | | | |
| | | ১৪৭৪ | ৩৯৩২ | |

তথ্য সূত্র
১. Siddiq Salik. Witness to Surrender, UPL, Dhaka, 1997, P-118.
২. Lt Gen JFR Jacob, Surrender at Dacca : Birth of a Nation, UPL, Dhaka, 1997, P-201.
৩. মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং এর বই The Liberation of Bangladesh-এ ভারতীয় অন্যান্য পদবীর মৃতের সংখ্যা ৩ জন বেশি অর্থাৎ ১২৯৩।

## পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি

| | সেনাবাহিনী | নৌবাহিনী | বিমান বাহিনী | আধাসামরিক বাহিনী | পুলিশ | বেসামরিক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অফিসার | ১,৬০৬ | ৯১ | ৬১ | ৭৯ | | |
| জুনিয়র কমিশনড অফিসার | ২,৩৪৫ | | | ৪৪৮ | | |
| পেটী অফিসার (নৌবাহিনী) | | ৩০ | | | | |
| ওয়ারেন্ট অফিসার (বিমানবাহিনী) | | | ৩১ | | | |
| অন্যান্য পদবির সৈনিক | ৬৪,১০৯ | ১,২৯২ | ১০৪৯ | ১১,৬৬৫ | | |
| নন কমব্যাটান্ট | ১,০২২ | | | | | |
| পুলিশ | | | | | ১৬৬ | |
| সকল পদবীর বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ | | | | | | ৭,৫৫৫ |
| | ৬৯,০৮২ | ১,৪১৩ | ১,১৪১ | ১২,১৯২ | ১৬৬ | ৭,৫৫৫ |
| | | | | | | সর্বমোট = ৯১,৫৪৯ |

তথ্য সূত্র Maj, Gen Shukhwant Singh, The Liberation of Bangladesh, Lancer Publisher, New Delhi 1980, P-224